শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজভাবনার দ্বিমাসিক

আল-আমীন বার্তা

জুলাই-অক্টোবর ২০১৬

মহাশ্বেতা দেবীর বাস্তবতা

শিশুদের চিরসখা কৈলাস সত্যার্থী

মসজিদ নির্মাণের জন্য আবেদন

আল-আমীন মিশনের মূল ক্যাম্পাস, খলতপুর উদয়নারায়ণপুর হাওড়ায় দু-বিঘে জমির ওপর তিনতলা **'আল-আমীন জামে মসজিদ'**-এর নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। আগামী দুই বছরের মধ্যে তা শেষ হবে ইনশাআল্লাহ্। মোট আয়তন প্রায় ১৯ হাজার বর্গফুট। ক্যাম্পাসের এক হাজার ছাত্র-সহ প্রায় তিন হাজার মানুষ একত্রে নমাজ পড়তে পারবেন। এই পবিত্র ও মহৎ উদ্যোগে আপনাদের সবাইকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাই। আপনার দান **'Al-Ameen Jame Masjid'**-এর নামে চেকে বা ড্রাফটে পাঠাতে পারেন।

সাফল্য: একনজরে ২০১৬

জয়েন্ট এন্ট্রান্স

মেডিকেল	১০০০-এর মধ্যে	১৫০০-এর মধ্যে	২০০০-এর মধ্যে	২৩০০-এর মধ্যে
	১৬২	২৭০	৩৬৫	৪২১
ইঞ্জিনিয়ারিং	৫০০০-এর মধ্যে	৭৫০০-এর মধ্যে	১০০০০-এর মধ্যে	১৫০০০-এর মধ্যে
	৪১	৬৫	৮৬	১১০

ডব্লিউবিসিএস

গ্রুপ-এ (এক্সি.)

সাহিনা আখতার

ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় সাফল্য

এ পর্যন্ত আল-আমীন মিশন থেকে মোট ৫৫ জন ডব্লিউবিসিএস গ্রুপ-এ, গ্রুপ-বি, গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি পরীক্ষায় সফল হয়ে বিভিন্ন সরকারি বিভাগে চাকরিরত।

এ-বছর ডব্লিউবিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফল হয়েছে আল-আমীনের ৪২ জন ছাত্র-ছাত্রী। যার মধ্যে ৩৮ জনই আবাসিক (ছাত্র ৩৩, ছাত্রী ৫)।

গ্রুপ-এ
রমজান আলি

গ্রুপ-বি
সেখ সামসুদ্দিন

উচ্চ-মাধ্যমিক

মোট পরীক্ষার্থী ১৫৩৫

	পরীক্ষার্থী	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
ছাত্র (বিজ্ঞান)	৯৮১	৩৪	৫১৯	৯২৬	৯৮১
ছাত্রী (বিজ্ঞান)	৪৮৯	১১	২৪২	৪৪৬	৪৮৮
ছাত্র ও ছাত্রী (কলা)	৬৫	৯	৪৫	৬০	৬৪
মোট	১৫৩৫	৫৪	৮০৬	১৪৩২	১৫৩৩

গ্রেড		সফল
O	(৯০%–১০০%)	৫৪ জন
A+	(৮০%–৮৯%)	৭৫২ জন
A	(৭০%–৭৯%)	৬২৬ জন
B+	(৬০%–৬৯%)	১০১ জন

মাধ্যমিক

মোট পরীক্ষার্থী ৭৭৮

পরীক্ষার্থী		৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
ছাত্র	৫৪৫	৬৮	৩৫৩	৪৭৯	৫২৫
ছাত্রী	২৩৩	৩২	১৩৩	২০০	২২৩
মোট	৭৭৮	১০০	৪৮৬	৬৭৯	৭৪৮

গ্রেড		সফল
AA	(৯০%–১০০%)	১০০ জন
A+	(৮০%–৮৯%)	৩৮৬ জন
A	(৬০%–৭৯%)	২৬২ জন

আবাসিক শাখা

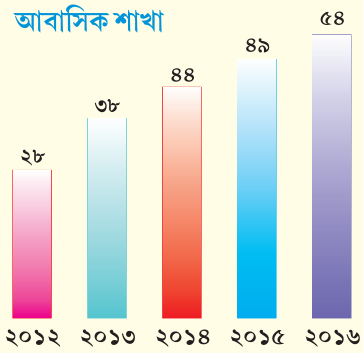

আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী

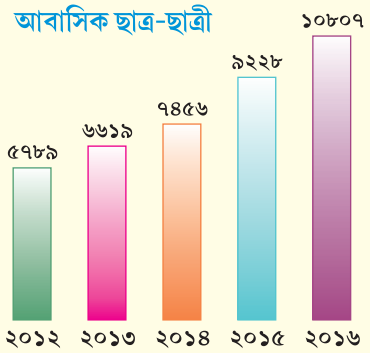

মাধ্যমিক পাস ছাত্র-ছাত্রী

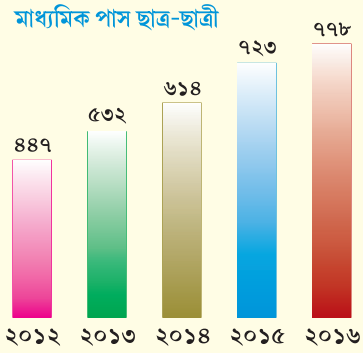

এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রী

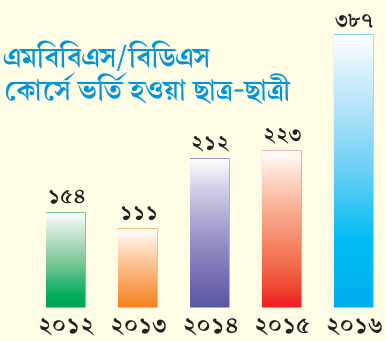

বি.টেক/বি.ই. কোর্সে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রী

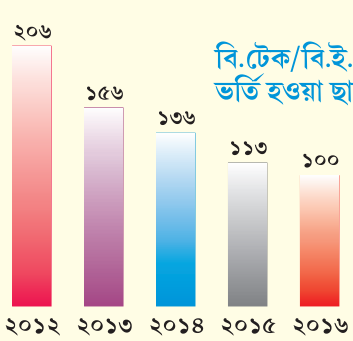

উচ্চ-মাধ্যমিক পাস ছাত্র-ছাত্রী

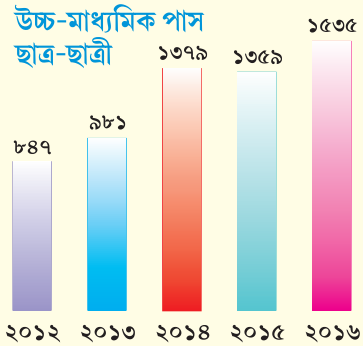

আল-আমীন বার্তা

জুলাই-অক্টোবর ২০১৬ | চতুর্থ-পঞ্চম যুগ্ম সংখ্যা

পরামর্শ পরিষদ
ননীগোপাল চৌধুরী একরাম আলি সেখ মহম্মদ হাসান
সেখ মারুফ আজম এম আব্দুল হাসেম মাইনুদ্দিন আহমেদ

সম্পাদক
এম নুরুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
শেখ হাফিজুর রহমান

সম্পাদনা সহযোগী
দিলদার হোসেন একরামূল হক শেখ
আসাদুল ইসলাম সেলিম মল্লিক

জনসংযোগ
মহম্মদ আসরাফুল হোসেন মহম্মদ আলমগীর বিশ্বাস
সেখ মোমিনুর রহমান তসলিম আরিফ
সেখ মহম্মদ ইস্রাফিল মহম্মদ মহসীন আলি

ইন্টারনেট সংস্করণ
আব্দুল কাইয়ুম বিশ্বাস

বর্ণস্থাপন এবং গ্রাফিক্স
মহম্মদ গোলাম কিবরীয়া

আল-আমীন মিশন ট্রাস্টের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম কর্তৃক প্লট নং ডি জে ৪/৯, অ্যাকশন এরিয়া ১, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং ডায়মন্ড আর্ট প্রেস ৩৭এ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯ থেকে মুদ্রিত।

মতামত এবং লেখা পাঠাবার ঠিকানা
নির্বাহী সম্পাদক, আল-আমীন বার্তা, ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০ টাকা, সডাক ২০০ টাকা ● **প্রতি সংখ্যা** ২৫ টাকা

দূরভাষ ০৩৩-২২২৯ ৩৭৬৯
e-mail: alameenbarta@gmail.com
weblink: www.alameenmission.org
facebook.com/alameen.barta

মিশন সমাচার

রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলোতে এবার যত জন ভর্তির সুযোগ পেয়েছে, তাদের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ আল-আমীনের ছাত্র-ছাত্রী। এমনটা এ-রাজ্যে আগে ঘটেনি। বিস্ময়কর এই ঘটনার আশ্চর্য বিবরণ এই পাতায়।

লিখেছেন **আসাদুল ইসলাম**

মেডিকেলে সবার ওপরে আল-আমীন

৬ পাতায়

কিংবদন্তি

ছেলেবেলায় স্কুলের সিঁড়িতে বসে তাঁরই বয়সি এক বাচ্চাকে জুতো পালিশ করতে দেখে, তাঁর মধ্যে জন্ম নিয়েছিল ক্রোধ। সেই ক্রোধ ক্রমে সংকল্পের প্রেরণা হয়ে তাঁকে আজীবন যুক্ত রেখেছে শিশুশ্রম নির্মূল করার ব্রতে। সুইডিশ অ্যাকাডেমি দিয়েছে নোবেল।

লিখেছেন **সেলিনা সরকার**

১৫ পাতায়

শিশুদের চিরসখা কৈলাস সত্যার্থী

সূচিপত্র

স্মরণ ১

অবহেলিত এবং পিছিয়ে পড়তে পড়তে যেসব শব্দ পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠীর নিভৃত সংলাপে আশ্রয় পেয়েছে, সেইসব শব্দ তাঁর গল্প আর চরিত্রগুলোকে নির্মাণ করেছে।

লিখেছেন **একরাম আলি**

মহাশ্বেতার বাস্তবতা ১৯ পাতায়

স্মরণ ২

রিংয়ের রাজা মহম্মদ আলি

শতাব্দীর সেরা খেলোয়াড়। শুধু খেলোয়াড়ই ছিলেন না— তাঁর কিছু বলার ছিল, কিছু করারও ছিল। এবং দুটোই তিনি করেছেন। বর্ণবিদ্বেষের প্রতিবাদে ওহাইয়ো নদীর জলে ছুড়ে ফেলেছেন অলিম্পিকের স্বর্ণপদক।

২৩ পাতায়

লিখেছেন **অনুরূপ ভৌমিক**

উজ্জ্বল প্রাক্তনী

গত তিরিশ বছরে আল-আমীন মিশন সমাজকে উপহার দিয়েছে বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রী। সেইসব প্রাক্তনীদের উপস্থিতি এই বিভাগে এই সংখ্যায় অধ্যাপক **মহম্মদ সোহেল রানা**

লিখেছেন **আসাদুল ইসলাম** ২৮ পাতায়

জীবনে কিছু করতে হলে নিজেকে ফাঁকি দিয়ো না

সাত-পাঁচ

এটি নানান টুকরো টুকরো বিভাগের সমন্বয়। ভাষা, দেশ, বই, মহাকাশ, কী নেই! রত্নে ভরা আলিবাবার গুহা যেন।

৪২ পাতায়

পাঠকনামা	০৪
সম্পাদকীয়	০৫
শিখরদেশ	৩৩
বিশ্ববিচিত্রা	৩৫
রত্ন চতুষ্টয়	৩৮
আমার বাড়ি আল-আমীন	৪০
আমাদের পাতা	৪৭

ভূপৃষ্ঠে দম্ভ ভরে বিচরণ কোরো না, তুমি তো কখনোই পদভারে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না।

— আল-কোরআন, সুরা বনি-ইসরাইল, আয়াত ৩৭

আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবি করিম (স.)-কে জিজ্ঞেস করলেন— হে আল্লাহ্‌র রসুল (স.)! আমার কাছে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী কে? তিনি বললেন— তোমার মা। লোকটি ফের জিজ্ঞেস করলেন, তার পর কে? তিনি বললেন— তোমার মা। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তার পর কে? তিনি বললেন— তোমার মা। আবার জিজ্ঞেস করলেন লোকটি, তার পর কে? তিনি বললেন— তোমার পিতা।

—সহিহ্ বোখারি শরিফ, হাদিস সংখ্যা ৫৫৪৬

অসীমের অনুভব

'আল-আমীন বার্তা' নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৫ সংখ্যাটি পড়ে মুগ্ধ হলাম। এই সংখ্যার 'রবীন্দ্রনাথের গানে সুফি-ভাবনা' বিষয়ক প্রবন্ধটি আমাদের চৈতন্যকে সমৃদ্ধ করেছে। মরমি তত্ত্বের সাধনায় যিনি নিয়োজিত ইসলামের পরিভাষায় তিনি সুফি নামে অভিহিত। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অবস্থান করাকে সুফিরা বলেন 'ফানা ফিল্লাহ্' আর আল্লাহ্‌র সঙ্গে স্থায়ীভাবে বিলীন হয়ে যাওয়া 'বাকা বিল্লাহ্' অর্জিত হলে সুফি দর্শন অনুযায়ী সুফি আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ শক্তিতে শক্তিমান হন। আর তখন সুফির অন্তরে সার্বক্ষণিক শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করে। প্রবন্ধকার সংগতভাবেই জার্মান কবি গ্যেটে, ইরানের কবি হাফেজ ও রুমির প্রসঙ্গ এনেছেন। অপর পরিসরের আলোকে 'গীতাঞ্জলি'-পর্বের গান-কবিতাগুলিকে ফিরে দেখা খুব তাৎপর্যপূর্ণ প্রচেষ্টা।

অসীমকে অনুভব করা যায়, বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, এমন ভেবেছেন প্রবন্ধকার ঈশ্বর বা পরমের 'transcendent' গুণের ক্ষেত্রে। অপরদিকে 'immanent' গুণে পরম হয়ে ওঠেন প্রেমাস্পদ। বৈষ্ণব পদাবলিতে পরমের সঙ্গে সম্পর্কের মাত্রা বোঝাতে তিনটি ভাবের কথা বলা হয়েছে— সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা। পরমের সঙ্গলাভে নিজের ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করবার ঐকান্তিক বাসনা থেকে উদ্‌বোধিত হয় সাধারণী ভাব। পরমের সঙ্গে শাস্ত্রসম্মত পরিণয় বন্ধনের দ্বারা পারস্পরিক সঙ্গসুখলাভের বাসনা থেকে সমঞ্জসার উদ্ভব। ভক্তহৃদয়ের স্বতঃসিদ্ধ ভাব, যার একমাত্র লক্ষ ভগবানের তৃপ্তি সাধন, তা সমর্থা নামে পরিচিত। সমর্থা সর্বশ্রেষ্ঠ, কেননা, এখানে ভক্তের কাছে সমাজ সংসার সব মিথ্যে হয়ে যায়, পরমই একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে। 'গীতাঞ্জলি'র নিবেদনে তাই মিলেমিশে থাকে সুফি ও বৈষ্ণব ভাবনা— প্রেমাস্পদ হয়ে ওঠে বন্ধু, বন্ধু হয়ে ওঠে প্রেমাস্পদ—

তৃপ্ত তুমি আমার গীতরাগে
ভালো লাগে তোমার ভালো লাগে
জানি আমি এই গানেরই বলে
বসি গিয়ে তোমারই সম্মুখে।
মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই,
গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই,
সুরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে
বন্ধু বলে ডাকি মোর প্রভুকে।

আঘাত দিয়ে চিরদিনের জন্য ঋণী করে রাখবার কথা কবিরা বার বার বলেছেন। 'Unrequitted love' প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার আঘাতের ঋণকে প্রসারিত করে বলেছেন, বিরহ শুধুই বেদনা দেয় না, তা বেদনাকে কখনো কখনো সুন্দর করে তোলে। প্রেমের ক্ষেত্রে অতৃপ্তি তাই অনেক সময় সদর্থক। সুখেও মানব-মন কেঁদে ওঠে, হাসিতে বেদনা ঝরে পড়ে। সুফি-ভাবনার আলোকে 'গীতাঞ্জলি'র গান-কবিতাগুলোকে প্রবন্ধকার মরমি ভাবে উপস্থাপন করেছেন। যে অরূপ রতনের খোঁজ তিনি পেয়েছেন, তা সতত উজাগর থাকুক।

ড. পীযূষ পোদ্দার, কল্যাণী, নদিয়া।

ঐকান্তিক প্রচেষ্টা

দীর্ঘ ছ-টি বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে অনলস ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে যেভাবে 'আল-আমীন বার্তা' প্রকাশিত হচ্ছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। সম্ভবত ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে 'আল-আমীন বার্তা'র যাত্রা শুরু। প্রথম সংখ্যাটির গুণ ও মান দেখে পত্রিকাটি সাদরে গ্রহণ করি এবং আজ পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যা সংগ্রহে আছে। অনেক পত্রপত্রিকা কাছে আছে, কিন্তু সার্বিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে 'আল-আমীন বার্তা' একটি ভিন্নধর্মী রুচিসম্পন্ন পত্রিকা।

'আল-আমীন বার্তা'র জানুয়ারি-জুন ২০১৬ সংখ্যাটি আগের সংখ্যার মতো অনবদ্য ও চমৎকার। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা নয়নাভিরাম। সম্পাদকীয়টি পড়ার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি এবং পড়ে নিজেদের ঋদ্ধ করি।

মিশনের প্রিয় শিক্ষিকা নাসিমা খাতুনের অকাল প্রয়াণের খবর অনেক পাঠকের হৃদয়ে মোচড় লাগিয়ে দিয়েছে।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক জাহিরুল হাসানের গবেষণাধর্মী লেখা 'বাংলার মুসলমানের জাগরণ কালের এক নেতা' অর্থাৎ অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী শের-এ-বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক সম্পর্কে অল্প হলেও অনেক অজানা কথা জানলাম।

আইনুল হক খাঁ-র 'ইংলণ্ডে প্রথম ভারতীয়' এবং বঙ্কিম মাহাতর 'সোনার পাখি সোনার গাছ' লেখাদুটি খুব ভালো লাগল।

এন জুলফিকারের পশুপাখি নিয়ে গবেষণাধর্মী লেখা খুব ভালো লাগে। তার সঙ্গে আবার সংযুক্ত হল এক নতুন মাছের কথা, যার নাম ঝাঁই মাছ।

সাড়ে চারশো বছরের প্রাচীন আকবরি ব্রিজ পরিকল্পনা করেছিলেন, আফগান স্থপতি আফজল আলি। এই ব্রিজের অনেক অজানা কাহিনি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া ডাকঘরের ইতিহাস, ভারতীয় রেলের ইতিহাস এই পত্রিকা থেকে জানলাম।

আর্থিক দুর্বলতা যে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় নয়। ইচ্ছা ও মনের জোর থাকলে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছোনো যায়, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল বাবনান ক্যাম্পাসের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী রুকাইয়া খাতুন। তার দেওয়া সাক্ষাৎকারটি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

শেষে বলি— নৌরিন সুলতানা, সেখ মুজিবর রহমান, মহম্মদ রায়হান সরদার, খাদিজা পারভিনদের কচি হাতের কাঁচা লেখাগুলি পাঠকদের মনে দাগ কাটবে, আশা করা যায়।

সেখ হাবিবুর রহমান সেখ মহম্মদ তারিক আজিজ
বনহরিশপুর, পাঁচলা, হাওড়া।

মবয়সি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়াপ্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।' আমাদের সময়ে তেমনই বিরল এক ভারতসন্তানকে আমরা দেখছি, যাঁর সম্বন্ধে কবির ওই উক্তিটি প্রযোজ্য। তিনি কৈলাস সত্যার্থী। পরিবারের এবং সমাজের নানা প্রতিবন্ধকতায় শিক্ষার অঙ্গন পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে না যারা, সেইসব শিশুকে বর্ণমালায় শোভিত করবার কী যে প্রাণান্ত চেষ্টা, তাঁর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তিতে আজ গোটা দুনিয়া সে-খবর জানে।

কিন্তু, ওইটুকুই। কৈলাস সত্যার্থীর কাজের খুঁটিনাটি কতটা জানি আমরা? বা অশিক্ষা দূরীকরণে তাঁর লাগাতার শ্রমের পরিচয় সম্বন্ধে? খুবই কম জানি।

একই বছরে মালালা ইউসুফজাইও পান নোবেল পুরস্কার, যাঁকে পুরস্কার গ্রহণের মঞ্চে কাছে টেনে কৈলাস সত্যার্থী বলেছিলেন— মালালাই তাঁর মানসকন্যা। মালালা ইউসুফজাই কে— এ-প্রশ্ন আজ অবান্তর। স্কুলে যাওয়ার জেদে তাঁর প্রাণসংশয় মালালাকে বিখ্যাত করে দেয়। পরে মেয়েদের শিক্ষার অধিকারকে নিঃসংশয় করবার কাজে তিনি সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ফলে, কৈলাস সত্যার্থীর প্রসঙ্গো তাঁর কথাও এসে পড়ে।

বাংলাভাষার বিশিষ্ট লেখক এবং সমাজকর্মী মহাশ্বেতা দেবীর প্রয়াণ বাঙালির অপূরণীয় একটি ক্ষতি। দেশ-বিদেশের বহু পুরস্কারে তিনি সম্মানিত। মহাশ্বেতা দেবী অসাধারণ রচনাবলি যেমন রেখে গিয়েছেন, তেমনই নিজের কাজের মাধ্যমে যেন বলতে চেয়েছেন— সমাজের অন্ত্যেবাসীদের কাছে যাও। দেখো তারা কেমন আছে। তাদের সহমর্মী হও। জায়গা দাও তাদের নিজের পাশে। এমন এক ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করা মানে তাঁর গুণাবলিকে সম্মান জানানো। আমরা বিশ্বাস করি— যে-জাতি গুণীর সম্মান করে না, সেই জাতির মধ্যে গুণীর জন্মও হয় না। এবারের 'আল-আমীন বার্তা'য় কৈলাস সত্যার্থী এবং মহাশ্বেতা দেবীকে নিয়ে থাকছে দুটি লেখা। কেন?

আমরা মনে করি, এইসব মানুষের চলার পথের রেখায় আল-আমীন মিশনের এগিয়ে চলার পথেরও কোনো-না-কোনোভাবে মিল রয়েছে। তাঁদের পথের এই স্পর্শটুকু আমাদের পাথেয়। না-হলে এটা কী করে সম্ভব হল যে, এ-বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলোতে জেনারেল সিটে যারা ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেল, তাদের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ছাত্র-ছাত্রী আল-আমীন মিশনের?

বেশ কয়েক বছর ধরেই আল-আমীনের ছেলে-মেয়েরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় নজরকাড়া ফল করে আসছে। কেন? একটু দেখি।

আল-আমীন মিশনে যখন কোনো ছাত্র-ছাত্রী পড়তে আসে, নানা সূত্রে একটা প্রশ্নের মুখোমুখি তাকে হতেই হয়— বড়ো হয়ে সে কী হবে। উত্তরদাতার গায়ে মলিন পোশাক। শরীরে অপুষ্টির চিহ্ন। পায়ে ময়লা চটি বা জুতো। এমন শক্ত আর দূরপ্রসারী প্রশ্নের সামনে সেই নড়বড়ে শিশুটির শুধু চোখদুটোতেই তখন প্রত্যয়ের অস্বাভাবিক জ্বলে ওঠা— সে ডাক্তার হবে। যাঁরা শোনেন, অভিজ্ঞতা থেকে উত্তরটা তাঁরা আগেই জানতেন। বিষয়টি নিয়ে অনেক ভেবেছি আমরা— কেন সংখ্যাগরিষ্ঠ পড়ুয়া ডাক্তার হতে চায়? তাদের একা ডেকে মুখোমুখি কথা বলেছি। জেনেছি, প্রত্যেকের একটা করে নিজস্ব গল্প আছে, যা জীবনের এবং নিদারুণ কষ্টের। তাদের পরিবারের কেউ-না-কেউ মারা গেছেন যথোপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে বা বিনা চিকিৎসায়। সেই গল্পটিকে আমরা দুইভাবে দেখেছি। এক— যারা আল-আমীনের পড়ুয়া, তারা এসেছে সংখ্যালঘু সমাজ থেকে এবং অধিকাংশ জনই গ্রামের, যেখানে চিকিৎসক দুর্লভ। দুই— প্রকট অর্থাভাব। এইসব শিশু ভেবেছে, নিজেরা যদি চিকিৎসক হতে পারে, যে মর্মান্তিক মৃত্যু তারা দেখেছে পরিজনদের, তেমনটা হয়তো আর দেখতে হবে না। নিজেরাই চিকিৎসা করতে পারবে।

আল-আমীনের সাধ্য সীমিত। তবু আমরা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এইসব শিশুর লক্ষ্যকে গুরুত্ব দিয়ে আসছি। আল-আমীন সাধ্যাতীত চেষ্টা করছে তাদের লক্ষ্যপূরণে। উদ্দেশ্য একটাই— এইসব পড়ুয়া যে-কষ্ট পেয়েছে, অন্যের সেই কষ্ট যেন তারা লাঘব করতে পারে। পিছিয়ে-পড়া সমাজ যেন উঠে আসে। বিরাট এই কর্মযজ্ঞে সরকারের এবং অসংখ্য শুভার্থীর সহযোগিতার কাছে আমরা ঋণী।

মেডিকেলে সবার

রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলোতে এবার যত জন ভর্তির সুযোগ পেয়েছে, তাদের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ আল-আমীন মিশনের ছাত্র-ছাত্রী। এমনটা এ-রাজ্যে আগে ঘটেনি। বিস্ময়কর এই ঘটনার ও তার চরিত্রদের আশ্চর্য বিবরণ এই পাতায়।

আসাদুল ইসলাম

প্রথম ৫০০ জনের মধ্যে ৬৬ জন, ১০০০ জনের মধ্যে ১৬২ জন, ১২৫০ জনের মধ্যে ২২২ জন, ১৫০০ জনের মধ্যে ২৭০ জন, ১৭৫০ জনের মধ্যে ৩২১ জন, ২০০০ জনের মধ্যে ৩৬৫ জন, ২৩০০ জনের মধ্যে ৪২১ জন। একনজরে আল-আমীন মিশনের ২০১৬ সালের জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলের ফল এটা। এ-বছর রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ১৮ থেকে ২০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী আল-আমীন মিশনের। প্রিয় পাঠক, যে-শ্রেণিকক্ষে এইসব ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ নেবে, সেই শ্রেণিকক্ষের কথা একবার কল্পনা করে দেখুন— শ্রেণিকক্ষের একটা বড়ো অংশ জুড়ে আল-আমীন মিশনের উপস্থিতি। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের আর কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই সাফল্য নেই। অতীতেও ছিল না। আল-আমীন মিশনের এই সাফল্য অর্জনকে ঐতিহাসিক ছাড়া আর-কিছু কি বলা যায়?

সেই ২০০৬ সাল থেকে আল-আমীন মিশন থেকে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে সুযোগ পেয়ে আসছে। ২০১৫ সালে যখন ২৯৭ জন ছাত্র-ছাত্রী ২৫০০-এর মধ্যে র‍্যাঙ্ক করেছিল, সেটা ছিল আল-আমীন মিশনের রেকর্ড সাফল্য। আমাদের মতো সন্দেহবাতিক যাঁরা, তাঁরা হয়তো আমার মতোই ভেবেছিলেন, এই সাফল্য (মানে ২০১৫ সালের সাফল্য) 'বাইচান্স বাবলা ফুল ফোটা'র মতো— হঠাৎ করে পেয়ে যাওয়া। সন্দেহ ছিল ভবিষ্যতে এই ধারাবাহিকতা আল-আমীন মিশন ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু তিনি, আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক, জানতেন বলেই হয়তো দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন— '২০০৪ সালে ৪৪ জন দিয়ে জয়েন্ট মেডিকেলে বড়ো সাফল্য পাওয়ার যাত্রা শুরু হয়েছে আমাদের। এরপর ৫০ থেকে ১০০, ১০০ থেকে ২০০, ২০০ থেকে ৩০০ জন— ক্রমাগত বেড়ে চলেছে সংখ্যাটা। ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরও বাড়বে।' এম নুরুল ইসলামের গত বছরের কথা যে এ-বছর সত্যি-সত্যি ফলে যাবে, তা সেই সময় বিশ্বাসই করা যায়নি। প্রতিবছর রেকর্ড ফল করা, পরের বছর আবার সেই রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড করা— এটা কি সহজে বিশ্বাস করা যায়? অথচ এই কাজটাই করে চলেছে আল-আমীন মিশন। রেকর্ড ভেঙে রেকর্ড ফল করা যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। এ যেন নতুন এক খেলা ভাঙার খেলা!

গত সংখ্যার 'আল-আমীন বার্তা'য় মিশনের বার্ষিক ফল নিয়ে যে-প্রতিবেদন লিখেছিলাম, সেখানেই উল্লেখ করেছিলাম ২০১৬ সালের জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেল পরীক্ষা সর্বভারতীয় না রাজ্য স্তরে হবে, তা নিয়ে টানাপোড়েনের কারণে ফল প্রকাশ হতে দেরি হওয়ায়, সেই সংখ্যায় জয়েন্ট এন্ট্রাস মেডিকেলের খবর দেওয়া গেল না বলে, এখন, জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলের ফল নিয়ে লিখতে বসে মনে হল, এটা যেন পূর্বনির্ধারিতই ছিল! কেননা মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, জয়েন্ট এন্ট্রান্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সঙ্গে নয়, একটা পৃথক প্রতিবেদনই যে লিখতে হবে এবারের জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলের ফল নিয়ে, সেটা আমরা না বুঝতে পারলেও, সবার অলক্ষে সেটা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই।

এই প্রতিবেদন লেখার শুরুতেই আপনাদের এ-বছরের জয়েন্ট এন্ট্রান্স

ওপরে আল-আমীন

মেডিকেল পরীক্ষার সার্বিক ফলের সংক্ষিপ্ত ছবি তুলে ধরেছি। এবার আমরা কিছু ছাত্র-ছাত্রীর ফল আপনাদের সামনে তুলে ধরব। ফল নিয়ে লেখার সময় প্রতিবারই উল্লেখ করতে হয় যে, প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী সম্পর্কে লেখা সময় ও সুযোগের অভাবের কারণে সম্ভব হয় না। জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে সফল ছাত্র-ছাত্রীদের নাম, ফোন নম্বর সংবলিত ১২ পাতার তালিকা নিয়ে বসে আছি। আমার পছন্দমতো কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলে, তাদের লড়াই-সাফল্যের কথা তুলে ধরলাম আপনাদের সামনে।

প্রথমেই আসি আল-আমীন মিশনের মধ্যে সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্ককারী সাইফুল্লা সেখের কথায়। সাইফুল্লা এবার রাজ্য স্তরে ৪০ র‍্যাঙ্ক করেছে। এ-বছর রাজ্যে মোট ৫৪৮৮৯ জন ছাত্র-ছাত্রী জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেল পরীক্ষায় বসেছিল। রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড ১২১৮৩ জন সফল ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা প্রকাশ করে। যদিও এদের মধ্যে জেনারেল র‍্যাঙ্কার হিসেবে প্রায় ২৩০০ জনের মেডিকেল পড়ার সুযোগ হয়েছে। রাজ্যের সেরা মেধাবীদের মধ্যে ৪০-তম র‍্যাঙ্ক সাইফুল্লার। সাইফুল্লার বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ফলতা থানার গোবিন্দবাটি গ্রামে। মাত্র পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়া সাইফুল্লার আব্বা মনতাজ সেখ হকারি করেন। মনতাজ সেখের তিন পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে সাইফুল্লা মেজো। বড়োভাই ইতিমধ্যে দর্জির কাজে লেগে গেছেন। সাইফুল্লাকেও কোনো হাতের কাজে লেগে যেতে হত হয়তো, যদি না আবদুল হাবিব মোল্লা সাইফুল্লার হাত ধরে আলোর ঠিকানায় পৌঁছে দিতেন। আবদুল হাবিব মোল্লা কে? সাইফুল্লার মামা। হাবিব সাহেবের বাড়ি থেকেই সাইফুল্লা মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। একাদশ শ্রেণিতে হাবিব সাহেব সাইফুল্লাকে আল-আমীন মিশনে ভর্তি করেন। বিনা ব্যয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পায় সাইফুল্লা। ২০১৫-র উচ্চ-মাধ্যমিকে সাইফুল্লা পেয়েছিল ৮৯.৬ শতাংশ নম্বর। একই সঙ্গে জয়েন্টে র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ১৮০০-র কাছাকাছি। ভর্তি হয়নি। এ-বছর তার চমকপ্রদ ফল করা ছিল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। সাইফুল্লার ফল নিয়ে কথা হল হাবিব সাহেবের সঙ্গেই। শুনে অবাক হলাম যে, তিনিও সেই ১৯৯৯ সালে আল-আমীন মিশনে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। দু-চোখে স্বপ্ন ছিল বড়ো হওয়ার। কিন্তু ভর্তির পরীক্ষায় সফল হতে পারেননি বলে আল-আমীন মিশনে ভর্তি হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয়নি। এখন তিনি প্রাইমারি স্কুলের প্যারা টিচার। ভাগনা তাঁর অপূরিত স্বপ্ন পূরণ করেছে। হাবিব সাহেবের এখন নেশা ভালো ছেলেমেয়েদের আল-আমীন মিশনে ভর্তি করানো। তাঁর এক ছাত্র আল-আমীন মিশনেই জয়েন্ট কোচিং নিচ্ছে। আল-আমীন মিশন নিয়ে তাঁর এক লাইনের মন্তব্য— ‘গরিব ছেলেদের এত যত্ন নিয়ে পড়ানোর আর জায়গা কোথায়?’

২০১৬ সালের জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে আল-আমীন মিশন থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্ককারীর নাম সেখ মহম্মদ হাবিব। তার র‍্যাঙ্ক ৫৫। হাবিবের বাড়ি হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার কোদালপুর গ্রামে। তার আব্বা সেখ আবদুল সেলিমের লেখাপড়া খুবই সামান্য, তার মা বাশিরা বেগমের থেকেও কম। বাশিরা বেগম পড়েছেন ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত। আবদুল সেলিম দর্জির কাজ করেন। মেঘালয়ের শিলংয়ে তাঁদের দর্জির দোকান। সেলিম সাহেব নিজের উপার্জন ছেলেমেয়েদের পড়ার পিছনে খরচ করতে কৃপণতা করেননি। বলা ভালো, তাঁর উপার্জনের অনেকটাই ব্যয় করেন ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য। মহম্মদ হাবিব আল-আমীন মিশনে সম্পূর্ণ খরচ দিয়েই জয়েন্টের কোচিং নিয়েছে। গ্রামের স্কুল থেকে মাধ্যমিকে ৭৩ শতাংশ এবং উচ্চ-মাধ্যমিকে ৮৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ করার পর জয়েন্ট কোচিং নিতে এসেছিল আল-আমীন মিশনে। হাবিব এসেছিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নিতে। কিন্তু আল-আমীনের উঠোনে এসে তার সিদ্ধান্ত বদলে যায়। জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে অবশ্য একটা অসুবিধার মুখে পড়ে হাবিব।

ফোনে কথা বলার সময় জানাল সেই অসুবিধার কথা। 'জয়েন্টের কোচিং নিতে শুরু করে বায়োলজি বিষয় তেমন বিশেষ জানতাম না বলে অসুবিধায় পড়লাম। ক্লাসে বন্ধু আর স্যাররা অনেকটা সাহায্য করায় সে-অসুবিধা দূর হল। আল-আমীন মিশনের পরিবেশটাই এই সুবিধা দিয়েছিল। এটা না

প্রথমেই আসি সাইফুল্লা সেখের কথায়। সাইফুল্লা এবার রাজ্য স্তরে ৪০ র‍্যাঙ্ক করেছে।

পেলে মাত্র এক বছরের কোচিং নিয়ে আমি এই ফল করতে পারতাম না।'

হাবিবের থেকে কয়েক ধাপ নীচে ৬২ র‍্যাঙ্ক করে মিশনের মধ্যে তৃতীয় হয়েছে নূরনবি খান। নূরনবি ওবিসি হিসেবে রাজ্য স্তরে দ্বিতীয় হয়েছে। তার বাড়ি মালদা জেলার মানিকচক থানার চৌকি মীরদাতপুর গ্রামে। গ্রামের বেশিরভাগ পুরুষ দৈহিক শ্রমকে পুঁজি করে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেন। চাষবাসের মরসুমে দিনমজুরি করার সুযোগ থাকলেও বাকি সময় কাজ থাকে না। তাই বিদেশই ভরসা। এলাকায় পড়াশোনার হার যে কম, তা বোধ হয় খানিকটা আন্দাজ করাই যায়। নূরনবির আব্বা ঘিশু খানও বছরের বেশিরভাগ সময় কাটান দিল্লিতে। দিনমজুর হিসেবে যখন যে-কাজ পান সে-কাজই করেন। নূরনবি আল-আমীন মিশনে পড়েছে ক্লাস ফাইভ থেকে। মাধ্যমিকে পেয়েছিল ৮৪.২ শতাংশ নম্বর। উচ্চ-মাধ্যমিকে ৮৫.৪ শতাংশ। ২০১৪ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করার পর এক বছর কোচিং নেয়। ২০১৫ সালে তার র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ২৩৪৩। আরও এক বছর দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করার পরে এ-বছর সে চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করেছে। আল-আমীন মিশন সেই ক্লাস ফাইভ থেকেই প্রায় বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ না দিলে আজকের সাফল্য ছেলে পেত না বলে মনে করেন নূরনবির পিতা।

আল-আমীন মিশন থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্ককারীর নাম সেখ মহম্মদ হাবিব। তার র‍্যাঙ্ক ৫৫।

দুঃস্থ মেধাবী বেছে বেছে আপনাদের এই গল্প শোনাচ্ছি না। এরকম তো কত জনই আছে, তাদের মধ্যেকার কয়েক জনের কথা জানাব পরে। জানাব, কারণ, সাফল্য পেতে গেলে লড়াই করতে হয়, এ-কথা আমরা জানি, কিন্তু সে-লড়াই কতটা কঠিন হতে পারে, তা এইসব ছেলেমেয়েদের কথা না জানলে আমরা বুঝতেই পারব না। প্রথম দিকের র‍্যাঙ্ককারী তিন জন ছাত্রের কথা বলেছি। এবার আমরা তিন জন ছাত্রীর কথা জানাই আপনাদের।

গতবছর ২৫০০-র মধ্যে র‍্যাঙ্ক করা ২৯৭ জনের মধ্যে ৪২ জন ছিল ছাত্রী। এ-বছর সেই সংখ্যাটা এক লাফে বেড়ে হয়েছে ৯২ জন। এক সময় গোটা রাজ্যে ৫০ জন মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী একত্রে মেডিকেল পড়ার সুযোগ পেত না। সেই জায়গা থেকে আজ আল-আমীন মিশনের দৌলতে রাজ্যের সংখ্যালঘু মুসলমান মেয়েরা শুরু করেছে নতুন মশালদৌড়।

এ-বছরের মশালদৌড়ে সবার আগে আছে সাফিনা। সাফিনা খাতুনকে অনেকেই না হলেও, কেউ কেউ চিনতে পারেন, বিশেষ করে 'আল-আমীন বার্তা'র নিয়মিত পাঠক হলে। সাফিনা গতবছর উচ্চ-মাধ্যমিকে মেয়েদের মধ্যে মিশন-সেরা হয়েছিল ৯৩.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে। এ-বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে সাফিনা ৭৭ র‍্যাঙ্ক করে আবার মেয়েদের মধ্যে মিশন-সেরা। সাফিনা আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয়েছিল একাদশ শ্রেণিতে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মহেশতলা থানার দক্ষিণ চট্টা-কালিকাপুর গ্রামের সাফিনার জীবনটাই বদলে গেছে আল-আমীনের সঙ্গে সংযুক্তির মাত্র তিন বছর সময়ের মধ্যে। সাফিনার আব্বা গোলাম মহম্মদ সাদিক মণ্ডলের পড়াশোনা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। দর্জির কাজ করেন, কিছু কাজ কারিগরদের দিয়ে করিয়েও নেন। চট্টা-কালিকাপুর মেটিয়াবুরুজেরই বৃহত্তর অংশ বলা যায়। দর্জিশিল্পই প্রধান জীবিকা এলাকার মানুষের। সাফিনারা চার বোন দু-ভাই পড়াশোনা করেছে স্থানীয় সুবিদ আলি ইনসটিটিউশনে। চট্টা-কালিকাপুর এলাকার ব্যবসায়ী সুবিদ আলি এক সময় কাটা কাপড়ের ব্যাবসা করতেন। ব্যাবসা করে প্রভূত উন্নতি করার পর তিনি এলাকায় শিক্ষা বিকাশের জন্য যে-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন, পরবর্তীতে সেটাই সুবিদ আলি ইনসটিটিউশন নামে পরিচিত হয়। শুধু মেটিয়াবুরুজ-চট্টা এলাকার নয়, রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্তে যে আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তার পিছনেও ওই এলাকার বহু মানুষের আর্থিক অনুদান আছে। যদিও এইসব এলাকায় শিক্ষার আলো সেভাবে এখনও প্রসারিত হয়নি। এর কারণ বোধ হয় আর্থিক স্বচ্ছলতা, দর্জিশিল্প থেকে সহজে উপার্জন করতে পারার সুযোগ। মালদা-মুর্শিদাবাদের ছেলেমেয়েরা আবাসিক শিক্ষা আন্দোলন থেকে সব থেকে বেশি সুবিধালাভ করছে তাদের সাফল্য অর্জনের আকুতিকে সম্বল করে। মেটিয়াবুরুজ-চট্টা এলাকার ছেলেরা পড়াশোনা ছেড়ে ব্যাবসার দিকে পা বাড়ালেও মেয়েদের অনেকেই পড়াশোনা করে এগিয়ে চলেছে। সাফিনা ওইসব মেয়েদেরই প্রতিনিধি বলা যায়।

এই কথার হাতে গরম প্রমাণ দিই আসুন। রাজ্য স্তরে ৮২ র‍্যাঙ্ক করে

৬২ র‍্যাঙ্ক করে মিশনে তৃতীয় হয়েছে নূরনবি খান। নূরনবি ওবিসি হিসেবে রাজ্য স্তরে দ্বিতীয় হয়েছে।

সাফিনার পরেই আছে রাজিয়া সুলতানা। রাজিয়ার বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার ডালিয়াপুর গ্রামে। রাজিয়ার আব্বা মহম্মদ মোস্তফা মাধ্যমিক পাস করতে পারেননি। বিড়ি বেঁধে সংসার চালান। রাজিয়ার মা পড়াশোনা জানেন না। ঘরের রান্নাবান্নার কাজ সামলে বাকি সময় বিড়ি বেঁধে সহযোগিতা করেন স্বামীকে। রাজিয়া আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয়েছিল

ক্লাস এইটে। মাধ্যমিকে পেয়েছিল ৯১.১ শতাংশ নম্বর, উচ্চ-মাধ্যমিকে ৯১.২ শতাংশ। এক বছর জয়েন্ট কোচিং নিয়ে এ-বছর রাজিয়া ৮২ র‍্যাঙ্ক করেছে। প্রায় বিনা বেতনে রাজিয়াকে পড়ার সুযোগ দিয়েছে আল-আমীন মিশন। রাজিয়ার আর দুটো ভাই আছে, তাদের একজন আল-আমীন মিশন

এ-বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে সাফিনা ৭৭ র‍্যাঙ্ক করে আবার মেয়েদের মধ্যে মিশন-সেরা।

থেকে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ শেষ করে জয়েন্টের কোচিং নিচ্ছে। উচ্চ-মাধ্যমিকে ৮৫ শতাংশ নম্বর পাওয়া সেই ছাত্র জয়েন্ট এন্ট্রান্সে সাফল্য পাবে আশা করা যায়। বলা বাহুল্য, রাজিয়ার ভাইও ছাড় পেয়েই পড়াশোনা করছে। মালদা-মুর্শিদাবাদের মানুষেরা বিড়ি বেঁধে জীবিকা নির্বাহ করে যে-স্বপ্ন দেখছে, মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলের বাড়িতে বাড়িতে সে-স্বপ্নের চাষ কম। সাফিনাদের মতো যারা দেখছে তারা সফল হচ্ছে। সাফিনা যেমন আল-আমীন মিশন থেকে বিশেষ আর্থিক ছাড়ের সুযোগ পেয়েছে, সেভাবে সুযোগকে কাজে লাগাতে চেষ্টাটা শুরু করা দরকার।

রাজিয়া ৮২ র‍্যাঙ্ক করেছে। প্রায় বিনা বেতনে রাজিয়াকে পড়ার সুযোগ দিয়েছে আল-আমীন মিশন।

মেয়েদের মধ্যে আল-আমীন মিশন থেকে যে তৃতীয় সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্ক করেছে, তার বাড়িও মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়। গ্রামের নাম বড়োকামাত। এই গ্রামের সারমিন খাতুন রাজ্য স্তরে ৮৮ র‍্যাঙ্ক করে মিশনের মধ্যে তৃতীয় হয়েছে। সারমিন একাদশ শ্রেণিতে আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয়েছিল। ২০১৪ সালে ৮৩ শতাংশ নম্বর নিয়ে উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করার পর দু-বছর কোচিং নিয়ে ৮৮ র‍্যাঙ্ক করেছে। গতবছর সারমিনের র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ২২০০-র কাছাকাছি। সারমিন-রাজিয়ার যেমন জেলা ও থানা একই, তেমনি মিল আছে আরও একটা বিষয়ে। রাজিয়ার এক ভাই আল-আমীনে কোচিং নিচ্ছে ডাক্তার হওয়ার লক্ষ্যে, অন্যদিকে সারমিনের ভাই অলিউল ইসলাম আল-আমীন থেকে কোচিং নিয়ে ডাক্তারি তৃতীয় বর্ষের ছাত্র এখন। দুই ভাই-বোনই আল-আমীন থেকে বিশেষ আর্থিক ছাড় নিয়ে পড়াশোনা করে পৌঁছে গিয়েছে সাফল্যের দোর গোড়ায়। আল-আমীন মিশনের দৌলতে এক-একটা পরিবারে একাধিক ছেলে-মেয়ে যে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, সে-কথা 'আল-আমীন বার্তা'র পাঠক মাত্রই জানার কথা। সারমিনকে নিয়ে লেখার জন্য কথা বলেছিলাম সারমিনের আব্বা সফিকুল ইসলামের সঙ্গে। মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়া সফিকুল সাহেব ছোটো মুদিখানা চালান। সারমিনের মা আকতারা বিবি ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছেন। অবসরে তিনি বিড়িও বাঁধেন। এই পরিবারের দুই সন্তান ডাক্তার হলে আগামী দশ বছরে পরিবারের সার্বিক অবস্থায় যে-পরিবর্তন আসবে, তা অন্য কোনোভাবে সম্ভব কি? এলাকায় আল-আমীন মিশন কতটা বদল আনতে পেরেছে, এ-ব্যাপারে সফিকুল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করায় বললেন, 'এ-বছরই সারমিনের চার সহপাঠী আল-আমীন মিশন থেকে ডাক্তারিতে চান্স পেয়েছে। চার জন ডাক্তার হয়েছে ইতিমধ্যে। আর জনা তিরিশেক হবে ডাক্তারি পড়ছে আশপাশের এলাকা থেকে।'

প্রথম দিককার মাত্র তিন জন ছাত্র আর তিন জন ছাত্রীর কথা বললাম। লেখাটা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে তাই এবার কয়েক শো লড়াকু দুঃস্থ-মেধাবীর মধ্যে থেকে দু-একজনের কথা বলে নিই।

প্রথমে বলি পায়রার কথা। পায়রা খাতুনের বাড়ি মুর্শিদাবাদের ভগবানপুর গ্রামে। তিন ভাই ও দুই বোনকে এতিম করে দিয়ে তার আব্বা দুনিয়া ছেড়ে যখন চলে যান পায়রা তখন চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। দিনমজুরি করে আব্বা তবু সংসারটাকে টিকিয়ে রেখেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর কী হবে? অকূল পাথারে যখন পরিবারটা ভাসছে, তখন বিড়ির পাতা-মশলা হাতে তুলে নিয়ে পায়রার মা হয়ে যান বিড়ি-শ্রমিক। আর তার দাদা তার আব্বার মতোই দিনমজুর। মা-দাদা হাজার কষ্টেও পায়রাকে আর-একজন বিড়ি শ্রমিক হতে না দিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সবরকম সহযোগিতা করলেন। গ্রামের স্কুল থেকে ৬৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করার পর পায়রা আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয়। শুরু হয় তার স্বপ্ন-উড়ান। ৭৬.৪ শতাংশ নম্বর পায় উচ্চ-মাধ্যমিকে। সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পাওয়া পায়রা এ-বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে র‍্যাঙ্ক করেছে ৮৪১। পায়রা ডাক্তার হবে শুনে শুধু কেঁদে চলেন তার মা। ছ-বছর পর ডাক্তার হয়ে স্টেথো কাঁধে ঝুলিয়ে পায়রা যখন তার মায়ের হাতে হাত রাখবে— ভরসার হাত— তখন বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে হাতে কড়া পড়ে যাওয়া মায়ের হাতটা শক্ত ঠেকবে পায়রার নরম হাতে— সেই শক্ত দু-হাতে কত লড়াইয়ের ছোঁয়া লেগে আছে, তা কেবল অনুভব করতে পারবে পায়রা, দুনিয়ার আর-কেউ সে-লড়াইয়ের গল্প হাজার চেষ্টা করে কিছুটা জানতে পারলেও, অনুভব করতে পারবে না। এরকম ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আল-আমীন মিশন আছে, এটাই আল-আমীন মিশনের সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি। শিক্ষাক্ষেত্রে কাজের জন্য আল-আমীন মিশন অনেক পুরস্কার-সম্মাননা পেয়েছে। কিন্তু দিনের শেষে হিসেব করলে

সারমিন খাতুন রাজ্য স্তরে ৮৮ র‍্যাঙ্ক করে মিশনের মধ্যে তৃতীয় হয়েছে। সারমিন একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল।

ওইসব পুরস্কার-সম্মাননার চেয়েও অনেক বড়ো পাওনা হয়ে হিসেবের খাতায় জমা হয়েছে মুক্তো-সমান পায়রার মায়ের মতো শত শত মায়ের আনন্দাশ্রু।

মাসকুরার গল্পটা পায়রার মতো নয়, আবার পায়রার মতোও। মাসকুরার আব্বা দিনমুজুর, মা বিড়ি বেঁধে যতটা পারেন সাহায্য করেন। মাসকুরার

কথা কিছুটা তার মুখ থেকেই শুনি আমরা— 'আমরা তিন বোন, ভাই নেই। তিন বোনই পড়াশোনা করছি। আমার আব্বা দিনমজুরি করে সংসার চালান। ছোটোবেলা থেকেই আমার আব্বা-মা আমাকে কষ্ট করে পড়িয়েছে। টিউশনের স্যার আমাকে বই খাতা কিনে দিতেন। আমি বাড়ির কাজ করার

আল-আমীন মিশনের এই সাফল্য অর্জনকে ঐতিহাসিক ছাড়া আর কিছু কি বলা যায়?

জাহিদ মণ্ডল। মেডিকেল র‍্যাঙ্ক ৬৯

পর যে-সময় পেতাম, তা পড়াশোনার কাজে লাগাতাম। এভাবে চন্দ্রকোনা ইসলামিয়া হাই মাদ্রাসা থেকে ৭৬ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাধ্যমিক পাস করেছিলাম। স্যাররা সবাই বলাবলি করেছিলেন, আমি সায়েন্স টানতে পারব না। তা ছাড়া সায়েন্স পড়ার খরচও আমার আব্বা-মা জোগাতে পারবে না। আমাদের অঙ্কের স্যার আমাকে আল-আমীন মিশনের ভর্তির পরীক্ষা দেওয়ায়। পাস করি। আল্লাহ্ আমাকে মিশনে পড়ার সুযোগ দেন। মিশনে আমি সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়েছি। প্রথম দিকে আমি পড়া বুঝতে পারতাম না। ইলেভেনের শেষ দিকে ম্যাথ, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি বুঝতে পারায় পড়তে আনন্দ লাগল। উচ্চ-মাধ্যমিকে ৮৪.৪ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাস করি গতবছর। এক বছর কোচিং নিয়ে ৮৩০ র‍্যাঙ্ক হয়েছে আমার। আমি এ-বছর খুব খেটেছিলাম। ভেবেছিলাম মেডিকেল কলেজ, কলকাতায় সুযোগ পাব। এখন আমি সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছি। পরীক্ষার আগে অসুস্থ হয়ে না পড়লে হয়তো সিএমসিতেই পড়ার সুযোগ পেতাম। তবুও যেটা হয়েছে সেটাও হত না আল-আমীন মিশন পাশে না থাকলে। মেডিকেলে আমার র‍্যাঙ্ক হওয়াতে আমার আব্বা-মা তাদের স্বপ্নকে খুঁজে পেয়েছে। আমার মা তো আনন্দে লোকের সঙ্গে কথা বললেই কেঁদে ফেলে।' পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার মাসকুরাদের পরিবারের আনন্দের উৎস হয়ে উঠেছে আল-আমীন মিশন। এটাই আল-আমীন মিশনের সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি।

ফাহিম উদ্দিন লস্কর আল-আমীন মিশনে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল তিন-তিন বার পরীক্ষা দেওয়ার পর। প্রথমে ক্লাস ফাইভের সময়, দ্বিতীয় বার ক্লাস সেভেনে, তৃতীয় বার ক্লাস ইলেভেনে। ২০১৪ সালে আল-আমীন মিশন থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছিল ৭৯ শতাংশ নম্বর। ওই বছরই জয়েন্ট মেডিকেল র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ৩৭০৩। ২০১৫ সালে ১৮৯৯ র‍্যাঙ্ক করে নর্থ বেঙ্গল ডেন্টাল কলেজে পড়ার সুযোগ পেলেও আরও এক বছর চেষ্টা করে এমবিবিএস-এর জন্য। এ-বছর তার র‍্যাঙ্ক ১১৮৬। ফাহিম পুরো পাঁচ বছর নাম মাত্র বেতনে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছে। ফাহিম উদ্দিনের কথা সংক্ষেপে সারলাম আরও কয়েক জনের কথা জানানোর কারণে। ফাহিমের কথা এখানে উল্লেখ করার প্রধান কারণ দুটি। এক, আল-আমীন মিশনের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে গেলে চেষ্টাটা জারি রাখা দরকার। দুই, আল-আমীন মিশন যদি মনে করে কোনো ছাত্র-ছাত্রী সফল হতে পারে, তাহলে শেষ পর্যন্ত তার পাশে থাকে।

এবার আমরা যার কথা জানাতে চাই সরাসরি তার নিজের কথাই তুলে ধরছি— 'আমার নাম সলমান খান। বাড়ি নদীয়া। আব্বা ২০০২ সালে আমাদের ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান। তিনি মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিলেন। আমি ক্লাস টেন পর্যন্ত মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেছি, মামারা পাশে না থাকলে আমার হয়তো পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যেত। ক্লাস টেনের পর আমার পাশে দাঁড়িয়েছে আল-আমীন মিশন। মিশন আমার পাশে না দাঁড়ালে আমি ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেতাম না। আমার মা মাঠে কাজ করে ফ্যামিলির খরচা ও আমার পড়াশোনার খরচা জোগাতে পারত না। পিছিয়ে-পড়া সমাজের মানুষ হয়েও আজ যে এত ভালো সুযোগ পেয়েছি, তার পিছনে মিশনের অবদান অনস্বীকার্য। আজ আমি খুবই খুশি যে আমি আমার ফ্যামিলিকে সাপোর্ট করতে পারব। এবং পিছিয়ে-পড়া সমাজের উন্নতিতে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারব।' উল্লেখ্য, সলমান এবার জয়েন্ট মেডিকেলে ১৩০৯ র‍্যাঙ্ক করেছে।

অন্য আর-একজনের কথা শুনুন— 'আমার নাম মহম্মদ শাহরুল হক গাজী। পিতা আবদুল ওয়াদুদ গাজী। বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। আমার আব্বা হার্টের রোগী। ছোটোবেলা থেকে আমি এবং আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্য, যেমন মা, দাদা, বোন প্রত্যেকে জরির কাজ করে সংসার চালাতাম। দারিদ্র্যের কারণে আমার পরিবার আমার পড়াশোনার খরচ চালাতে অক্ষম ছিল। সেজন্য নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত আমি আল-আমীন ফাউন্ডেশনে বিনা খরচে পড়ার সুযোগ পাই। ২০১২ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করেছি। এ-বছর, ২০১৬ সালে ১১২৮ র‍্যাঙ্ক করে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছি। মাঝের চার বছর র‍্যাঙ্ক করতে না পারলেও আল-আমীন মিশনের বিভিন্ন শাখায় আমি জয়েন্ট কোচিং নেওয়ার সুযোগ পেয়েছি প্রায় বিনা খরচে। মিশন আমাকে মানসিক ও আর্থিকভাবে সহায়তা না করলে আজ আমি কল্যাণী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারতাম না।'

সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পাওয়া পায়রা এ-বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে র‍্যাঙ্ক করেছে ৮৪১।

মাসকুরার কথা তার মুখ থেকেই শুনি আমরা— 'আমরা তিন বোন, ভাই নেই। তিন বোনই পড়াশোনা করছি।

এই লড়াই-কথন শেষ হওয়ার না। আমরা এই প্রতিবেদন লেখা শেষ করব আর দুজনের কথা বলে। প্রথম জনের বক্তব্য শোনা যাক— 'আমার নাম আবদুস সামাদ। বাড়ি বীরভূম জেলার মুরারই থানার দুলান্দী গ্রামে। ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় আমার আব্বা মারা যান। বাড়িতে তখন আমি, আমার

ছোটোভাই, ছোটোবোন ও মা। আমাদের বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তখন থেকে আমাকে বাড়িতে চাষের কাজ করতে হত। খুব কষ্টে আমাদের সংসার চলত। কাজের জন্য মাঝে মাঝে স্কুলে যেতে পারতাম না। এভাবে পড়াশোনা করে আমি মাধ্যমিকে ৬২৬ নম্বর পাই। তারপর আল-আমীন

এ-বছর তার র‍্যাঙ্ক ১১৮৬। ফাহিম পুরো পাঁচ বছর নাম মাত্র বেতনে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছে।

মিশনে ভর্তির পরীক্ষা দিই। পাস করি। সেক্রেটারি স্যার ইন্টারভিউয়ের সময় আমাদের বাড়ির অবস্থা জেনে এবং মাকে দেখে সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় আমাকে পড়ার সুযোগ করে দেন। তারপর মিশনে স্যারদের গাইড ও বন্ধুদের সহযোগিতা পেয়ে আমি পড়াশুনা চালিয়ে যাই। এ-বছর আমি আল-আমীন মিশনের বর্ধমান শাখায় ছিলাম। সেখানে আজিজুল স্যারের গাইড পেয়ে জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে ১০৭৬ র‍্যাঙ্ক করি। আমি এমবিবিএস-এ ভর্তি হয়েছি। মিশন না থাকলে আমার মতো এতিম ছেলে আজ এমবিবিএস পড়তে পারত না।'

'আমার নাম সলমান খান। বাড়ি নদীয়া। আব্বা ২০০২ সালে আমাদের ছেড়ে চলে যান। তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন ... '

এই প্রতিবেদন লেখা শেষ করছি সেখ হাসানের কথা আপনাদের শুনিয়ে। ৪৬০ জনের তালিকা থেকে কার কার কথা লিখি ভাবতে ভাবতে ১০৫ র‍্যাঙ্ককারী সেখ হাসানের নম্বরে ফোন লাগালাম। ওই ফোন নম্বর আসলে দেখলাম সেখ আতাউর রহমানের। আতাউর কে? মিশনের খাতায় হাসানের অভিভাবক। তিনি জানালেন, হাসানদের বাড়ি বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার জিনকরা গ্রামে। হাসানের আব্বা সেখ বদরে আলম ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছেন। চাষবাস করেন। মা রিজিয়া বেগম নিরক্ষর, গৃহবধূ। হাসান ছাড়া পরিবারে আরও এক ভাই ও এক বোন আছে। বোনটি গ্র্যাজুয়েশন করেছে, এখনও বিয়ে হয়নি। ভাই কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ ইভনিং কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র। দিনের বেলায় একটা খাবার সাপ্লাই সংস্থায় কাজ করে। হাসান আল-আমীন মিশনে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি পড়ার পর পাঁচ বছর জয়েন্ট কোচিং নিয়েছে। আল-আমীন মিশন হাসানকে বিশেষ আর্থিক ছাড় দিয়ে পড়ার সুযোগ দিয়েছে। এইসব জানার পর আতাউরকে জিজ্ঞাসা করলাম অভিভাবক হিসেবে আপনার নাম কেন মিশনের খাতায়?

'মিশনে পড়াশোনা করার ওর খরচটুকু আমি দিই।'

'সেটা কত?'

'আগে অনেকটাই কম লাগত। কোচিং নেওয়ার ক্ষেত্রে, যেমন এ-বছর প্রতিমাসে ২৪৯০ টাকা করে লেগেছে।'

'আপনি কি হাসানের আত্মীয়?'

'হ্যাঁ, খালাতো ভাই হই।'

'কী করেন?'

'হোটেল ক্যাটারিংয়ের যে-খাবার, সেই খাবার সাপ্লাই-বিক্রির ব্যাবসা করি।'

আরও দু-একটা কথার পর জানতে পারলাম এই আতাউরকে আমি চিনি। আল-আমীন মিশনের ২০১৫ সালের পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে আমার মতো যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই আতাউরকে মনে থাকার কথা। ওই উৎসব নিয়ে 'আল-আমীন বার্তা'য় লেখার সময় আতাউরের কথা 'আল-আমীন বার্তা'তে লিখেওছিলাম দু-এক লাইন। আতাউর আল-আমীন মিশনের প্রাক্তনী। সে-দিনের অনুষ্ঠানমঞ্চে আতাউর জানিয়েছিলেন, 'মাঠে কাজ করতে করতে যখন হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল, তখন মাঠ থেকেই বলা যায় আল-আমীন আমাকে তুলে এনে ঠাঁই দিয়েছিল।' আতাউরের আব্বা ছিলেন মানসিক ভারসাম্যহীন। বাঁকুড়া জেলার কোতলপুর থানার লঙ্কাজোল গ্রামের আতাউরকে ম্যানেজমেন্ট পড়তে দিল্লি পাঠিয়েছিল মিশন। খাবার তৈরির প্রতি অসম্ভব ভালোবাসা থাকায় আতাউর এখন খাবারের ব্যাবসা করেন। ব্যাবসা করা ব্যাপারটা বড়ো গোলমেলে। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার শব্দ দিয়ে যে আর্থিক অবস্থা আন্দাজ করা যায়, ব্যাবসা করেন বললে সেটা সহজে আন্দাজ করা যায় না। আতাউর নিজের পরিবারের আর্থিক হাল ফিরিয়েছেন। আত্মীয়দেরও আলোর বৃত্তে টেনে আনার লক্ষেই হাসানের পাশে দাঁড়িয়েছেন। হাসানের যে-ভাই কাজ করে পড়াশোনা করছে বলছিলাম একটু আগে, আসলে সে কাজ করে আতাউরের সংস্থাতেই। এক দশকেরও আগে আতাউর রহমানকে আল-আমীন মিশন তুলে এনে শুধু কোনো একজনকে আলোক-বৃত্তে তুলে আনেনি, কিংবা পরবর্তীতে আতাউরের পরিবারই কেবল দিন-বদলের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠেনি, আতাউরের হাতে জ্বলতে থাকা মশালের ছোঁয়ায় তাঁর খালাতো ভাইদেরও পরিবারে জ্বলে উঠেছে নতুন মশাল। মশাল এবার সেখ হাসানের হাতে। হয়তো তার হাত থেকে আলোকছটা ছড়িয়ে পড়বে অন্য কোনো হাসানের পরিবারে। আজকে যে-কজনের কথা আপনাদের শোনালাম আর ৪০০-র বেশি যেসব ছাত্র-ছাত্রীর কথা আপনাদের শোনানো গেল না, তারা প্রত্যেকেই এ-বছর

৪৬০ জনের তালিকা থেকে কার কার কথা লিখি ভাবতে ভাবতে ১০৫ র‍্যাঙ্ককারী সেখ হাসানকে ফোন করি।

শুরু করল নতুন মশালদৌড়। সেই মশালের আলোকছটা ছড়িয়ে পড়বে এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারে, সমাজের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এভাবেই সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটা হয়ে উঠছে আলোর ভুবন। আর সমাজের মানুষের কাছে আল-আমীন মিশন হল সেই আলোর ঠিকানা। সত্যিকার আলোর ঠিকানা।

রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণ

গত ২৯ জুলাই আল-আমীন মিশনের খলতপুর ক্যাম্পাসে রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণ ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান হয়। সকালে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্থানীয়

বিধায়ক সমীরকুমার পাঁজা। পিছিয়ে-পড়া সমাজের মেধার বিকাশে মিশনের অসামান্য অবদানের কথা তিনি উল্লেখ করেন, তিনি আশা প্রকাশ করেন, মিশনের ছাত্র-ছাত্রীরা কর্মজীবনে সফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য ও দেশের সুনামও বৃদ্ধি করবে। এই পর্বের অন্য অতিথি হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুলেখা পাঁজা ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে উৎসাহিত করেন।

সন্ধ্যায় দ্বিতীয় পর্বের রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণ অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক আব্দুর রাউফ। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে বাঙালির দুই চিরস্মরণীয় মনীষী হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এঁরা দু-জনেই রেনেসাঁর ফসল। রেনেসাঁ মানুষের স্বাধীনতা ও গুরুত্বকে সর্বোচ্চ প্রাথমিকতা দেয়। রেনেসাঁর অবদান যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান-মনস্কতা। তিনি আরও বলেন, দু-জনের কবিতায় মানুষের প্রতি সংবেদনশীলতা প্রকাশ পায়। কবি নজরুলকে মিশ্র সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সব সংস্কৃতির ভালোকে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তিনি। তাঁর মতে, মিশনের মেধাবী পড়ুয়ারা সফল পেশাদার হিসেবে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, শুধুমাত্র সফল পেশাদার হলে চলবে না, হতে হবে সংবেদনশীল মানুষও, যে-মানুষ অন্যের প্রতি দরদী ও অপরের ব্যথায় সমব্যথী হবে। তিনি আরও বলেন, মুখস্থ করে তথ্যের ভাণ্ডার বাড়ানো এবং জ্ঞানার্জন এক জিনিস নয়। কারণ, জ্ঞান হল সত্যের উপলব্ধি, আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্য যা খুবই জরুরি। অনুষ্ঠানের অন্য আলোচক 'বিধান শিশু উদ্যানে'র সম্পাদক ও শিক্ষক গৌতম তালুকদার মন্তব্য করেন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল বাঙালির জীবনচর্চার অঙ্গ এবং এঁদের বাদ দিয়ে বাঙালি হয় না। মিশনের প্রশস্ত সবুজ পরিবেশ ও নিয়মানুবর্তিতায় মুগ্ধ গৌতমবাবু পড়ুয়াদের উদ্দেশে বলেন, এই প্রতিষ্ঠানে যারা পড়াশোনা করছে, এটা তাদের সৌভাগ্য। অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম বলেন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক। আগামীতে মিশনের সব শাখায় নিয়মিত সংস্কৃতিচর্চার সুযোগ বাড়বে বলে তিনি জানান।

উল্লেখ্য, সকাল থেকেই দু-টি পৃথক আয়োজনে ছাত্র ও ছাত্রীদের নবীন বরণে আবৃত্তি, সংগীত, দেয়াল পত্রিকা 'অন্বেষণ' প্রকাশ, হাস্যকৌতুক-সহ নানা সাংস্কৃতির কর্মকাণ্ডে মুখরিত ছিল মিশন চত্বর। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি চলা এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী ও শিক্ষিকা মুস্তাব সেরা রাউফ, মিশন পরিবারের দাদু ননীগোপাল চৌধুরী, মিশনের সুপারভাইজার সেখ মারুফ আজম ও সুপারিনটেনডেন্ট এম আব্দুল হাসেম প্রমুখ।

আল-আমীনে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

ভারতবাসীর জন্য স্বাধীনতা দিবস কেবল আনন্দোৎসব নয়, এই দিনটি পরম পবিত্রও। আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় দিবসগুলোর স্মরণ বরাবরই আল-আমীন মিশনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা এবং অসম, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড ও বিহারে বিস্তৃত মিশনের আবাসিক ও অনাবাসিক ৭০-টি ক্যাম্পাসে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে ৭০-তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম বলেন, দেশের স্বাধীনতা অর্জনের স্মরণ অনুষ্ঠান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অফিস-আদালতকেন্দ্রিক হওয়ার ফলে, বৃহৎ সংখ্যক দেশবাসী দিনটির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে না। অবহেলিত, বঞ্চিত ও প্রান্তিক ভারতবাসীর কাছে এই উদ্‌যাপনকে পৌঁছোতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তোমাদের হৃদয়ে জাতীয় পতাকা যেন সারাজীবন উড্ডীন থাকে।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান হয় মিশনের মূল ক্যাম্পাস খলতপুরে। বালক-বালিকা বিভাগের দুটি পৃথক অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন-সহ ছাত্র-ছাত্রীদের নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন মিশনের সুপারভাইজার সেখ মারুফ আজম ও সুপারিনটেনডেন্ট এম আব্দুল হাসেম এবং মিশন পরিবারের দাদু ননীগোপাল চৌধুরী। আল-আমীন মিশনের বিভিন্ন শাখার মধ্যে হরিহরপাড়া ক্যাম্পাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন হরিহরপাড়ার বিডিও সুশান্তকুমার বালা এবং পাঁচুড় শাখায় বিশিষ্ট সমাজসেবী আলমগীর ফকির।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৩ অগাস্ট থেকে খলতপুর ক্যাম্পাসের মাঠে 'আল-আমীন মিশন ইন্টার ব্রাঞ্চ নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টে' সিনিয়র ও জুনিয়র বিভাগে বিভিন্ন শাখার মোট ৪৬-টি টিম অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতাটির উদ্‌বোধন করেন উদয়নারায়ণপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় সামন্ত। তিন দিনের এই

প্রতিযোগিতায় জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় যথাক্রমে ধুলিয়ান ও খলতপুর শাখা। ১৫ অগাস্ট রাত ১০ টায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন উদয়নারায়ণপুর থানার ওসি শৈলেন্দ্র উপাধ্যায়। চ্যাম্পিয়ন, রানার্স-সহ সেরা খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তিনি।

শিক্ষা কর্মশালা

পিছিয়ে-পড়া সমাজে শিক্ষার উৎকর্ষের প্রসার ও বেশি বেশি সংখ্যক পড়ুয়াকে এর আওতায় আনার জন্য আল-আমীন মিশন ধারাবাহিকভাবে প্রচেষ্টারত। গত ৫ সেপ্টেম্বর রাজ্যের ১৭-টি জেলা ও প্রতিবেশী রাজ্যে বিস্তৃত মিশনের শাখাগুলিতে 'শিক্ষক দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় আল-আমীন একাডেমি, উনসানি শাখায়। স্বাগত ভাষণে

মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম বলেন, মিশনের লক্ষ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্পকলা প্রভৃতিতে দক্ষ আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলা। অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবুল খায়ের জালালউদ্দিন এবং বিশিষ্ট শিক্ষিকা সুদেষ্ণা মৈত্রকে মিশনের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

পরের দিন ৬ সেপ্টেম্বর পার্কসার্কাসের আল-আমীন মিশন স্টাডি সার্কলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওরিয়েন্টেশনের এক বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা অধ্যাপক জালালউদ্দিন শিক্ষাক্ষেত্রে আরও নীবিড় ও ব্যাপক আন্দোলনে সামিল হতে আল-আমীন মিশনের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষাকে কেবলমাত্র শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয় ও মিশনে সীমাবদ্ধ না রেখে, এটিকে গণ-আন্দোলনের রূপ দিতে হবে। কারণ, এভাবেই 'শিক্ষা প্রত্যেকের জন্য' সফল হবে। তিনি শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তন, কথন, পঠন, লিখন ক্ষমতার বৃদ্ধির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরও আলোচনা করেন। দুটো অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মিশন পরিবারের দাদু ননীগোপাল চৌধুরী, অধ্যাপক রমজান আলি মণ্ডল, কবি একরাম আলি, কাজী আব্দুল বসির, তাবারক হোসেন মিস্ত্রি প্রমুখ।

'আলোর পথে' মালদা

ধরাবাঁধা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সমাজ উন্নয়নেও সদর্থক ভূমিকা পালনের এক উজ্জ্বল উদাহরণ মালদা জেলা পুলিশ। গত ৭ সেপ্টেম্বর মালদা জেলা পুলিশ কালিয়াচক ব্লকের কয়েকটি বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান 'আলোর পথে' আয়োজন করে। উল্লেখ্য, এই শুভ উদ্যোগের সহযোগী আল-আমীন মিশন। সুজাপুরের নয় মৌজা সুবহানিয়া হাই মাদ্রাসা ও নয় মৌজা হাই স্কুলে যৌথভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই উদ্যোগের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে জেলার পুলিশ সুপার অর্ণব ঘোষ বলেন, 'আমরা যারা আলোর পথে আছি, তাদেরকেই দায়িত্ব নিতে হবে সমাজের শিক্ষা-বিমুখ ও প্রগতি-বিরোধীদের আলোর পথে ও উন্নতির পথে সামিল করার।' তিনি তাঁর কর্মজীবনের নানান উদাহরণ তুলে জানান, এই জেলার কয়েকটি স্থানকে অনেকেই অন্য চোখে দেখেন। তিনি জোর দিয়েই বলেন, এইসব অনালোকিত এলাকাগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে অচিরেই। কারণ, শিক্ষার্থীরাই পারে অন্ধকার দূর করতে, অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে।

'আলোর পথে' আয়োজনের সহযোগী আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, দারিদ্র্যের মোড়কে আসা সন্তানরাই আল-আমীন থেকে বেশি সফল ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সামাজিক রূপান্তরেও এর প্রভাব দৃশ্যমান। মালদা জেলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মিশনের প্রায় এগারো হাজার পড়ুয়ার শতকরা পনেরো ভাগই এই জেলার। এ-বছরের রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলের মেধা-তালিকায় ২৫০০ র‍্যাঙ্কের মধ্যে মিশনের মোট ৪৬০ জনের নাম আছে। এর মধ্যে মালদা জেলারই ৭৬ জন। তিনি এই জেলার শবনম বানু ও মুর্শিদাবাদের হাটপাড়া গ্রামের উদাহরণ দিয়ে জানান, শিক্ষাই একমাত্র পারে দারিদ্র্যমুক্ত ও অপরাধশূন্য সমাজ গড়তে। এই পর্বে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নয় মৌজা সুবহানিয়া হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মহ. আদিল হোসেন, নয় মৌজা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহ. নজর হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন মালদার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দেবাশিস নন্দী।

মজামপুর এইচ এস এস বি হাই স্কুল ও ভগবানপুর কে বি এস হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত পরের দুটি সভায় অর্ণব ঘোষ ও এম নুরুল ইসলাম এই শুভ উদ্যোগে সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। মালদা জেলা পুলিশ প্রশাসনের তরফে পুলিশ সুপার অর্ণব ঘোষ আল-আমীন মিশনকে স্মারক সংবর্ধনা পত্র প্রদান করেন। এটি গ্রহণ করেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। মজামপুর হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মহ. সাবেত আলি ও ভগবানপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আতাউর রহমান শিক্ষার এই আলোকধারায় সবাইকে সামিল হতে অনুরোধ করেন। উপস্থিত ছিলেন ভগবানপুর হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন শিক্ষক হাজি একদিল আহমেদ প্রমুখ।

শেষ সভাটি অনুষ্ঠিত হয় আল-আমীন একাডেমি, বৈষ্ণবনগর ক্যাম্পাসে। মিশনের ছাত্রীরা পুলিশ সুপার-সহ সবাইকে সারিবদ্ধভাবে অভ্যর্থনা জানায়। অর্ণব ঘোষ তাঁর বক্তব্যে মেয়েদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ওপর জোর দেন। এম নুরুল ইসলাম পুলিশ সুপার অর্ণব ঘোষের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, 'অপরাধী ধরো, জেল ভরো' ভাবনার বাইরে 'আলোর পথে'র এই নজির অচিরেই আমাদের রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। তাঁর আশা, জেলা পুলিশের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে আল-আমীন মিশনের তরফে এই জেলায় শিক্ষাবিস্তারে আরও বেশি বেশি উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে সফল কালিয়াচক

ব্লকের ২৭ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। উল্লেখ্য, ২৭ জনের মধ্যে একজন বাদে সবাই আল-আমীন মিশনের পড়ুয়া। জেলা পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকগণও জেলার সমাজ উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেন। মিশনের বেলপুকুর শাখাপ্রধান মাইনুদ্দিন আহমেদ এবং এমবিবিএস পাঠরত মিশনের প্রাক্তনী লায়লা ফাতেমা জোহরা প্রমুখও পড়ুয়াদের উৎসাহিত করেন।

প্রাক্তনীদের জাকাত প্রদান

২০০৬ উচ্চ-মাধ্যমিকের ২৫ জন প্রাক্তনী জাকাতের মোট এক লক্ষ টাকার চেক তুলে দিচ্ছেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলামের হাতে। মিশনের সেন্ট্রাল অফিস কলকাতায় গত ২ জুলাইয়ের ঘটনা এটি।

মিশনের সেন্ট্রাল অফিসে গত ১১ জুলাই মিশনের প্রাক্তনী ডোমকল মহকুমা হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. হুমায়ুন কবীর এম নুরুল ইসলামের হাতে আড়াই লক্ষ টাকা তুলে দেন। সেখানে মিশনের আরেক

প্রাক্তনী ও ডা. হুমায়ুন কবীরের সহধর্মিণী ডা. তনুজা কবীরও উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৮ জুলাই মিশনের কলকাতা অফিসে, আল-আমীনের ২০০০ সালের উচ্চ-মাধ্যমিকের প্রাক্তনীরা তাঁদের 'শিক্ষার জন্য জাকাত' ফান্ড থেকে এক লক্ষ আট হাজার টাকা তুলে দেন তাঁদের স্যার এম নুরুল ইসলামের হাতে। উল্লেখ্য, প্রতি বছর সেবাকাজের লক্ষ্যে মিশনকে একটি করে অ্যাম্বুলেন্স দান করেন মিশনের প্রাক্তনী মোরসেদ আলি মোল্লা।

নয়াবাজে নবীন বরণ

নবীনের জয়গান চিরকাল গাওয়া হয়। গত ৩ অগাস্ট মিশনের নয়াবাজ শাখার পড়ুয়ারা মেতে ওঠে নবীন বরণ উৎসবে। মিশন পরিবারের রীতি অনুযায়ী দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্ররা নবাগত একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বরণ করে। পাঠরত ও নবাগত পড়ুয়ার আলাপন এবং সংকল্পের আদান-প্রদান ঘটে। সারাদিন ধরে চলে আবৃত্তি, গজল, কুইজ-সহ নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রকাশিত হয় দেওয়াল পত্রিকা 'দিগন্ত'র তৃতীয় সংখ্যা। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি সমাজসেবী সফিউদ্দিন মল্লিক ছাত্রদের বড়ো স্বপ্নের বাস্তবায়নে অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী হওয়ার পরামর্শ দেন। এই আয়োজনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রবিউল হোসেন খান, উমর ফারুক সরদার, মীর নুরুদ্দিন প্রমুখ শিক্ষকবৃন্দ, উনসানি শাখার ইনচার্জ মাহবুব রহমান, নয়াবাজ শাখার সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও ইনচার্জ খন্দকার মহিউল হক প্রমুখ।

শিশির অধিকারীর প্রয়াণ

শিশির অধিকারী আর নেই। ২৬ জুলাই ২০১৬ চুয়াত্তর বছর বয়সে আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন রবীন্দ্র-অনুরাগী এই মানুষটি (জন্ম ১ ডিসেম্বর ১৯৪২)। কবিতা লিখতেন। এক বন্ধুর প্রয়াণে লিখেছিলেন, 'জীবনের পথে/আমিও এসেছি প্রায় দাঁড়ির সম্মুখে।' সেই দাঁড়িতেই থমকে গেল এক আদর্শ শিক্ষকের জীবন। আল-আমীন মিশনের সঙ্গে জড়িয়েই ছিলেন। তবে, অবসরজীবনের পর একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন আল-আমীনের সঙ্গে। উদয়নারায়ণপুর সারদাচরণ ইনসটিটিউট থেকে অবসরের সময় নিজেই এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'একটা আশ্রয় আমাকে অনেকটাই বাঁচিয়ে দেবে— আল-আমীন মিশন, আমার অবসর জীবনের শুকনো মরুভূমিতে স্নিগ্ধ মরূদ্যান।'

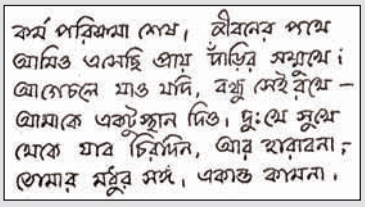

শিশির অধিকারী রচিত কবিতার পাণ্ডুলিপি।

আল-আমীন মিশনকে তিনি দেখেছিলেন স্নিগ্ধ মরূদ্যান হিসেবে। কিন্তু আল-আমীনের ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁকে পেয়েছিল জ্ঞানজগতের পরম আশ্রয়দাতারূপে।

উইলিয়ম আর্থার ওয়ার্ডের একটি বিখ্যাত উক্তি এরকম— 'মাঝারি মানের শিক্ষক বলেন। ভালো শিক্ষক বুঝিয়ে দেন। শ্রেষ্ঠ শিক্ষক করে দেখান। আর, মহান শিক্ষক ছাত্রকে অনুপ্রাণিত করেন।' শিশির অধিকারী ছিলেন ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রেরণার উৎস। মৃত্যুর কাছে মানুষ অসহায়। তবু তাঁর মতো মানুষের, প্রকৃত শিক্ষকের শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয় যে! ■

কোন ছেলেবেলায় স্কুলের সিঁড়িতে বসে তাঁরই বয়সি এক বাচ্চাকে জুতো পালিশ করতে দেখে, তাঁর মধ্যে জন্ম নিয়েছিল ক্রোধ। সেই ক্রোধ ক্রমে তাঁর সংকল্পের প্রেরণা হয়ে তাঁকে আজীবন যুক্ত রেখেছে শিশুশ্রম নির্মূল করার ব্রতে। এই কাজ করতে গিয়ে এক শ্রেণির মানুষের কাছ থেকে পেয়েছেন আঘাত। আবার পেয়েছেন বহু মানুষের ভালোবাসাও। সুইডিশ অ্যাকাডেমি দিয়েছে নোবেল। তিনি কৈলাস সত্যার্থী।

শিশুদের চিরসখা কৈলাস সত্যার্থী

সেলিনা সরকার

১০ ডিসেম্বর ২০১৪। নরওয়ের অসলো শহরে নোবেল পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সে-বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কার-প্রাপক মানুষটি। মিতভাষী, সৌম্য চেহারার মানুষটি বলে চলেছেন— তাঁর সারাজীবনের প্রচেষ্টাকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ভারতীয় একটি নীতিমূলক গল্পের সাহায্যে। জঙ্গলে আগুন লেগেছে। সব জীবজন্তু প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। জঙ্গলের রাজা সিংহও পালাচ্ছে। হঠাৎ দেখা গেল একটা পাখি উড়ে আসছে ঠোঁটে জল নিয়ে। সিংহ তাকে জিজ্ঞেস করল, সে কী করতে চায়। পাখিটা বলে, সে ঠোঁটে করে জল ছিটিয়ে আগুন নেভাতে চায়। সিংহ এই প্রচেষ্টাকে হাস্যকর বলে বিদ্রূপ করে। পাখিটি প্রত্যুত্তরে বলে, 'তুমি হাসতেই পারো। কিন্তু আমার নিজের যতটুকু ক্ষমতা, তা দিয়েই নিজের দায়িত্ব পালন করব।'

অপর একটি বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'চিরকাল থেকেই আমাদের দেশে বিভিন্ন মনীষী, শাস্ত্র প্রচার করে এসেছেন— ক্রোধ দমন করো। ক্রোধ মানুষকে ভুল পথে চালিত করে। কিন্তু আমি বলি, ক্রোধকে ধারণ করো। ক্রোধকে সঠিক গতি দাও। এই ক্রোধই তোমার চারপাশকে বদলাতে উদ্বুদ্ধ করবে।' তিনি বলেন, প্রথম তিনি রেগে গিয়েছিলেন, যে-দিন তাঁর জীবনে প্রথম হাই স্কুলে যাওয়া। স্কুলে প্রবেশ করার সময় দেখেন, তাঁরই বয়সি এক ছেলে বাবার সঙ্গে স্কুলের সিঁড়িতে বসে জুতো পালিশ করছে। এই দৃশ্য দেখে তিনি ক্লাস টিচারকে প্রশ্ন করেন, কেন ওই ছেলেটা তাঁদের মতো স্কুলে না পড়ে, ওরকম কাজ করছে। ক্লাস টিচার তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি। বরং তাঁর নাছোড়বান্দা প্রশ্নের জন্য তাঁকে বকাঝকা করেন। এটিও তাঁকে ক্রুদ্ধ করে। তারপর তিনি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন এ-প্রশ্ন। তিনি কৈলাসকে বোঝান ওই ছেলেটির পড়াশোনা না হওয়ার কারণ ওর দারিদ্র্য। ওর পরিবারই চায় না ও পড়ুক। বরং উপার্জনের কাজে হাত লাগালে পরিবারটির সুরাহা হবে।

এক সাক্ষাৎকারে কৈলাস জানান, এইসব উদ্ধার অভিযানের ফলশ্রুতি হিসেবে তাঁর শরীরের কোনো অংশ ভাঙতে বাকি নেই। পা ভাঙা, মাথা ভাঙা, কোমর ভাঙা, শরীরের বিভিন্ন অংশে একাধিক ফ্র্যাকচার হয়েছে। দু-জন সহকর্মীকে হারিয়েছেন।

এখানেও না থেমে ছেলেটির বাবাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেন, কেন তিনি নিজের ছেলেকে না পড়িয়ে ওসব করাচ্ছেন। সেই বাবা উত্তরে বলেন, 'বাবু, আমরা জন্মমুচি, আমার বাবাও মুচি ছিল, ঠাকুর্দাও মুচি। তাই

নোবেল পুরস্কারের ভাষণে আবেগ-আপ্লুত কৈলাস নিজের মানসকন্যা বলে মালালাকে সম্বোধন করেন।

আমার ছেলেও মুচি হবে। পড়াশোনা আমাদের জন্য নয়।' এই স্বীকারোক্তি তাঁকে যেমন হতাশ করল। তেমন ক্রুদ্ধও করল। ক্রোধ ঘনীভূত হয়ে রূপান্তরিত হল সংকল্পে। যে-পরিস্থিতি শিশুদের এই পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়, তাকে দূর করতে হবে। হয়তো এই প্রচেষ্টা আগুন নেভাতে যাওয়া ছোটো পাখিটার প্রচেষ্টার মতো এক অসম লড়াই। কিন্তু তিনি বিশ্বাস রাখতেন পদক্ষেপে। ছোটো ছোটো পদক্ষেপই একদিন শিখর জয় করে। এই সংকল্প, এই পদক্ষেপেই, ১৯৮০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর একশো চুয়াল্লিশটি দেশ থেকে প্রায় তিরাশি হাজার শিশুকে উদ্ধার করেছে তাঁর সংগঠন 'বচপন বাঁচাও আন্দোলন'। উত্তর ভারতের প্রান্তিক গ্রামের মানুষরা তাঁকে ডাকে— 'বাচ্চা কা মসিহা'। তিনি বলেন, 'Every single minute matters, every single child matters, every single childhood matters.'। তিনি কৈলাস সত্যার্থী।

জন্ম ১৯৫৪ সালের ১১ জানুয়ারি মধ্যপ্রদেশের বিদিশায়। লেখাপড়ায় বরাবরই মেধাবী ছিলেন। গভর্নমেন্ট বয়েজ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল থেকে পাস করে কলেজে ভর্তি হন। সম্রাট অশোক টেকনোলজিক্যাল ইনসটিটিউট থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন এবং হাই-ভোল্টেজ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট হন। এর কিছুদিন পরে ভোপালের একটি কলেজে লেকচারার পদে যোগ দেন। কিন্তু চাকরির নিরাপত্তা তাঁকে বেশি দিন টেনে রাখতে পারল না। যে-ক্রোধ তাঁর মধ্যে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল, তা যেন বিস্ফারিত হল। চাকরি ছেড়ে ১৯৮০ সালে যোগ দিলেন 'বন্ধন মুক্তি মোর্চা' নামের সংগঠনে। এই বছরই তিনি সূচনা করেন 'বচপন বাঁচাও আন্দোলন' সংগঠনের। 'বচপন বাঁচাও আন্দোলন' সংগঠনের কাজ হল— দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা শিশু, যারা লেখাপড়ার সুযোগ না পেয়ে কাজ করছে ইটভাঁটায়, পোশাকের কারখানায়, যাদের বাবা-মায়েরা মহাজনের কাছ থেকে ধার নিয়ে শোধ করতে না পারার দায়ে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের আজীবন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে কাজ করাচ্ছেন, তাদের মুক্ত করা। শিশুদের মুক্ত করার জন্য বিভিন্ন কারখানায়, শিশুশ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ ঘুপচি আবাসগুলিতে পুলিশ, বিভিন্ন এনজিওর সাহায্যে 'বচপন বাঁচাও আন্দোলনে'র কর্মীরা হানা দিতেন। অনেক সময় পুলিশের সাহায্য ছাড়া সামান্য লোকবল নিয়েও তাঁরা এই রেড করতে গিয়ে চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। গার্ডিয়ান ফিল্ম অসমের বর্তমান দিনে শিশুশ্রমিকদের প্রায় ক্রীতদাসের মতো অবস্থার ওপর একটি তথ্যচিত্র বানায়। সেখানে এক সাক্ষাৎকারে কৈলাস জানান, এইসব উদ্ধার অভিযানের ফলশ্রুতি হিসেবে তাঁর শরীরের কোনো অংশ ভাঙতে বাকি নেই। পা ভাঙা, মাথা ভাঙা, কোমর ভাঙা, শরীরের বিভিন্ন অংশে একাধিক ফ্র্যাকচার হয়েছে। দু-জন সহকর্মীকে হারিয়েছেন। একজনকে গুলি করা হয়েছিল এবং একজন শিশু উদ্ধারের সময় কারখানা কর্তৃপক্ষের ভাড়াটে গুন্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারা যান। বহুবার তাঁদের অফিস দুষ্কৃতিরা তছনছও করেছে। শেষবার তাঁর ওপর আক্রমণ হয় ১৭ মার্চ ২০১১, দিল্লিতে। ২০০৪ সালে গ্রেট রোমান সার্কাস থেকে শিশুদের মুক্ত করার সময় তাঁর ওপর যে-আক্রমণ হয়, তাতে তাঁর জীবনসংশয় হয়েছিল। রক্তাপ্লুত অবস্থায় মাটিতে পড়ে ছিলেন। ঠিক সময়ে হাসপাতালে পাঠানো হয় বলে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। কৈলাস সত্যার্থীর পদবি সত্যার্থী নয়। বংশগতভাবে তাঁর পদবি ছিল শর্মা। যা সমাজের উচ্চবর্ণের লোকেদের হয়। এখনও রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ— গো-বলয়ের এই রাজ্যগুলোতে হিন্দু-সমাজ জাতপাত, ছোঁয়াছুঁয়ি ইত্যাদি ভয়ংকর কুসংস্কারের অতল গর্ভে নিমজ্জিত। এখনও এখানে জাতপাতের নামে উচ্চবর্ণের মানুষরা নির্বিচারে নিম্নবর্ণের মানুষদের হত্যাও পর্যন্ত করে। ১৯৬৯ সালে গান্ধীজির জন্মশতবর্ষে পনেরো বছর বয়সি কৈলাস ঠিক করলেন, এই বিশেষ মুহূর্তকে একটু অন্যভাবে উদ্‌যাপন করা হবে। এই বিশেষ দিনটি তাঁরা অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য শ্রেণির মানুষের সঙ্গে কাটাবেন। তাঁদের সঙ্গে গল্প করবেন। তাঁদের হাতে তৈরি রান্না খাবেন। যদিও এ-ব্যাপারটা ছিল রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ, তবু কৈলাস এ-সাহস দেখালেন। তিনি দেখেছিলেন শহরঘেঁষা এলাকার কিছু উচ্চবর্ণীয় শিক্ষিত নেতা খুব কড়াভাবেই জাতপাতের ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রচার করছেন, তাই ওই নেতাদের কাছে তিনি ও তাঁর কয়েক জন বন্ধু প্রস্তাব দেন গান্ধী-জয়ন্তীতে যেন একটা আয়োজন হয়, সেখানে সমাজের উচ্চবর্ণের ওই নেতারা ও তিনি নিজে ও তাঁর বন্ধুবান্ধবরা তথাকথিত অস্পৃশ্যদের হাতের রান্না খাবেন। সবাই রাজি হলেন। অন্ত্যজ মানুষরা ভাবতেই পারতেন না এরকম কর্মসূচির কথা। কৈলাস সবাইকে রাজি করালেন। সাহস দিলেন। নির্দিষ্ট দিনে অস্পৃশ্য শ্রেণির পাঁচ জন (দু-জন পুরুষ ও তিন জন মহিলা) তাঁদের সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটি পরে, রান্নার সরঞ্জাম নিয়ে সদ্যনির্মিত মহাত্মা গান্ধী পার্কে জমায়েত হলেন। যেখানে এই আয়োজন হবার কথা

হয়েছিল। যথারীতি রান্নাও হল। কিন্তু দেখা গেল, যাঁদের খেতে আসার কথা, তাঁদের কেউ আসেননি। সন্ধ্যে বাড়তে বাড়তে সাতটা বাজল, আটটা বাজল। আটটার সময় কৈলাস আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। সাইকেল নিয়ে তিনি ও তাঁর বন্ধুরা ওই নেতাদের বাড়ি গিয়ে দেখলেন তাঁরা নেই। একজনের স্ত্রী বললেন, 'ওনার মাথা-যন্ত্রণা হচ্ছে, তাই যেতে পারবেন না।' আরেক জনের স্ত্রী বললেন, 'ঠিক আছে, যাও, উনি অবশ্যই যাবেন।' কৈলাসরা ফিরে এলেন পার্কে। রাত দশটা পেরিয়ে গেলেও কোনো নেতাকেই দেখা গেল না, এটাও তাঁর ভেতর সেই ক্রোধকেই আরও জাগিয়ে তুলল। মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির তলায় ক্লান্তিতে হাঁটু গেড়ে তিনি বসে পড়লেন, কোনোভাবেই নিজের আবেগকে ধরে রাখতে পারলেন না। চোখ বেয়ে নেমে এল বাঁধভাঙা অশ্রু। তখনই অনুভব করলেন কাঁধে কোমল একটি হাতের মাতৃসুলভ স্পর্শ। পরবর্তী কালে একটি বক্তব্যে কৈলাস বলেছেন, 'It was healing, motherly touch of an untouchable woman.'। এই স্পর্শ যেন আরোগ্যের। একজন তথাকথিত অস্পৃশ্য মহিলার মাতৃসুলভ স্পর্শ। সেই মহিলা কৈলাসকে বললেন, 'তুমি কাঁদছ কেন? তুমি তো তোমার যথাসাধ্য করেছ।' শেষরাতে কৈলাস যখন বাড়ি ফিরে এলেন, দেখলেন, উচ্চবর্ণের বিভিন্ন প্রতিনিধিরা তাঁদের বাড়িতে ভিড় জমিয়েছেন। তাঁরা হুমকি দিচ্ছেন পুরো পরিবারকে একঘরে করে দেওয়া হবে। ধোপা নাপিত বন্ধ করে দেওয়া হবে। শেষে তাঁরা কিছুটা শিথিল হলেন। শুধুমাত্র কৈলাসকে শাস্তি দেওয়া হবে এটা বিবেচিত হল। প্রায় সাড়ে সাতশো কিমি দূরের গঙ্গায় স্নান করে আসতে হবে এবং ফিরে এসে বড়োদের পা ধুয়ে সেই জল খেতে হবে। কৈলাস কোনো হুমকিকেই আমল দিলেন না। যতই অসুবিধা আসুক সব সহ্য করার ব্রত নিলেন, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, এই উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের বেড়াল-ইঁদুর খেলার জঘন্য ব্যবস্থাকেই একদিন একঘরে করবেন। উচ্চবর্ণীয় পদবি ত্যাগ করে নতুন পদবি নিলেন 'সত্যার্থী'। সত্যের অনুসন্ধানকারী।

শিশুদের মধ্যে কৈলাস সত্যার্থী।

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে— 'Morning shows the day.'। সকালের আবহাওয়ার পরিস্থিতি দেখেই বোঝা যায় সারাটা দিন কেমন যাবে। তেমন বড়োমানুষদের শৈশব দেখেই বোঝা যাবে ভবিষ্যতে তাঁরা কোন দিকে চালিত হবেন। যখন তাঁর বারো বছর বয়স, কৈলাস ও তাঁর বন্ধুরা ঠিক করলেন, যে-ছেলেমেয়েরা টাকাপয়সার অভাবে বই কিনতে পারে না, স্কুলে যেতে পারে না— তাদের সাহায্য করবেন। একটা অদ্ভুত পরিকল্পনা মাথায় এল। কৈলাস ও তাঁর বন্ধু একটা ঠেলাগাড়ি জোগাড় করলেন। তখন এলাকার সমস্ত স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। দুই বন্ধু গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে রাস্তা দিয়ে যান এবং যেসমস্ত ছাত্র-ছাত্রী বার্ষিক পরীক্ষায় ভালো ফল করেছে, তাদের শুভেচ্ছা জানাতে থাকেন। উৎসাহী লোকজন যখন তাঁদের দেখতে থাকেন, তখন তাঁরা আর্জি জানান, তাঁরা যেন তাঁদের বাড়িতে ছেলেমেয়েদের পাশ করে যাওয়া শ্রেণির বইগুলি কেজিদরে বিক্রি না করে এই ঠেলাগাড়িতে দিয়ে সাহায্য করেন। এই বই দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার কাজে লাগানো হবে। দুটো শিশুর এরকম আবেদনে বিপুল সাড়া পড়ে। ঠেলাগাড়ি বইয়ে ভরে ওঠে। এই বই শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের স্কুলের হেডমাস্টারকে দেন ও তাঁদের পরিকল্পনা বলেন। এইভাবে গড়ে উঠল বুক ব্যাঙ্ক, যা পরবর্তীকালে পরিণত বয়সে কৈলাস আরও বৃহত্তরভাবে তৈরি করেন।

১৯৯৮ সালের ১৭ জানুয়ারি শুরু হয় গ্লোবাল মার্চ এগেইনস্ট চাইল্ড লেবার। একশো চল্লিশটি দেশের বিভিন্ন এনজিও, শ্রমিক সংগঠন, শিক্ষানুরাগী, শিক্ষক, ছাত্র সবাই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শিশুশ্রম নির্মূল করার দাবিতে মিছিল করেন। শেষে কিছু মানুষ একটি বিশেষ মিছিল করেন সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে, যাঁদের বলা হত কোর মার্চার বা মিছিলের মূল কেন্দ্র। এই কোর মার্চার সবাই প্রবলভাবে শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী ব্যক্তি। এঁদের নেতৃত্বও দিয়েছিলেন কৈলাস। এই সময় জেনেভায় ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের মিটিং আয়োজিত হয়

'বচপন বাঁচাও আন্দোলন' সংগঠনের কাজ হল— দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা শিশু, যারা লেখাপড়ার সুযোগ না পেয়ে কাজ করছে ইটভাঁটায়, পোশাকের কারখানায়, যাদের বাবা-মায়েরা মহাজনের কাছ থেকে ধার নিয়ে শোধ করতে না পারার দায়ে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের আজীবন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে কাজ করাচ্ছেন, তাদের মুক্ত করা।

শিশুশ্রমের উপর কিছু প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে। এই সময় আইএলও দপ্তরের বাইরের মিছিল এই মিটিংয়ের সিদ্ধান্তকে যথেষ্ঠ প্রভাবিত করে এবং শিশুশ্রম দূর করতে আইএলও কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয়, যা পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক দেশ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে রূপায়ণ করে।

কৈলাস সত্যার্থী মনে করেন, শিশুশ্রমিক দূর করা কোনো সমাজসেবামূলক কাজ নয়, বরং এটি একটি চিকিৎসা। শিশুশ্রম ব্যাধিটির উৎস সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে রয়ে গেছে। দারিদ্র্য, তার জন্যে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সঙ্গে কৈলাস সত্যার্থী।

ঋণ নেওয়া, সেই ঋণ শোধ করতে না পারা, ফলে নিজের সন্তান-সন্ততিকে বাঁধা-শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে পাঠানো। তাই কৈলাস মনে করেন, শিশুদের শুধু মুক্ত করলেই হবে না, তারা যাতে পরিস্থিতির চাপে আর না কাজ করতে যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে হবে, কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। শিশুদের সামগ্রিক বিকাশ ঘটাবার উদ্দেশ্যে তিনি রাজস্থানে গড়ে তুলেছেন 'বাল আশ্রম'। 'বচপন বাঁচাও আন্দোলন' সংগঠন তাঁদের লক্ষ্যকে আরও পূর্ণতা দিতে দেশজুড়ে 'বাল মিত্র গ্রাম' তৈরি করে চলেছে। এই গ্রামগুলির লক্ষ্য হল সম্পূর্ণ শিশুশ্রমিকমুক্ত গ্রাম তৈরি করা এবং প্রতিটি শিশু যাতে স্কুলে যেতে পারে, তার ব্যবস্থা করা। শিশুদের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক বোধ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে মানসিকতা গড়ে তোলার জন্যে বিভিন্ন গ্রামে 'বাল পঞ্চায়েত' গড়ে তোলা হয়েছে। এই পঞ্চায়েতগুলি পরিচালিত হয় সম্পূর্ণ বালকদেরই দ্বারা এবং নির্বাচন হয় সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোও বিভিন্ন বিষয়ে এই বালক পঞ্চায়েতগুলোর মতামতও নেয়। বর্তমানে ভারতের প্রায় এগারোটি রাজ্যে এরকম সাড়ে তিনশোটি 'বাল মিত্র গ্রাম' গড়ে তোলা হয়েছে।

কৈলাস সত্যার্থীর অপর একটি আন্তর্জাতিক পরিচিতির কারণ Rugmark-এর ধারণার প্রচলন। বর্তমানে এই কার্যক্রম 'Good Weave International' নামে পরিচিত। কৈলাস সত্যার্থী তাঁর শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে যে-ব্যবস্থা নিলেন, তার নাম 'কনজিউমার অ্যাওয়ারনেস'। আমাদের বাড়িতে যে-কার্পেট পাতা হয়, এতে লেগে আছে অসংখ্য শিশুর চোখের জল। কারণ, এই কার্পেট কারখানাগুলিতে সস্তার শ্রমিক হিসেবে শিশুদের কাজে লাগানো হয়। শ্রম-আইন না মেনে তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাটানো হয়। ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লে আঘাত করে জাগানো হয়। শারীরিক নির্যাতন করা হয়। Rugmark হল এমন একটি সার্টিফিকেট, যা কোনো কার্পেটকে দিলে এটা বোঝাত যে, এই কার্পেট তৈরিতে কোনো শিশুশ্রমিক ব্যবহৃত হয়নি। এভাবে তাঁর আন্দোলনের খবর গোটা বিশ্বে কার্পেট-ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে গেল। বর্তমানে এই সংগঠন আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে। ভারত, নেপাল, আফগানিস্তানে এর দপ্তর আছে। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকার Good Weave সংগঠনগুলি খুব নিখুঁতভাবেই লাইসেন্সিংয়ের কাজ করে।

সারাটা জীবন শিশুদের জন্যে লুটিয়ে দেওয়া মানুষটিকে আবিশ্ব দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করেছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁকে নিতে হয়েছে। ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইন্টারন্যাশনাল লেবার কনফারেন্স, ইউনেসকোর বিভিন্ন সভায় প্রতিনিধিত্ব করেছেন। শিশুর অধিকার রক্ষার জন্য নির্মিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কমিটিতে তিনি রয়েছেন। যেমন সেন্টার ফর ভিকটিমস অব টর্চার (এইএসএ), ইন্টারন্যাশনাল লেবার রাইটস ফান্ড (ইউএসএ)। তিনি ইন্টারন্যাশনাল কোকোয়া ফাউন্ডেশনেরও এক্সিকিউটিভ বোর্ড মেম্বার। ২০১৫ সালে তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল কর্মসূচির ওপর কাজ করছেন।

কৈলাস সত্যার্থীকে নিয়ে অসংখ্য তথ্যচিত্র, টেলিভিশন সিরিজ তৈরি হয়েছে। সারাজীবনে অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। ২০১৪-তে নোবেল শান্তি পুরস্কার ছাড়াও পেয়েছেন হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বছরের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদীর পুরস্কার, ডিফেন্ডার অব দি ডেমোক্রেসি অ্যাওয়ার্ড, স্পেন থেকে পেয়েছেন অ্যালফনসো কোমিন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড, ইটালিয়ান সেনেট থেকে পেয়েছেন স্বর্ণপদক।

তিনি বলেন প্রতিটি শিশুকে উদ্ধারের পর তাদের হাসি যেন ঈশ্বরকে পাওয়ার শামিল, একবার কোনো এক জায়গায় রেডের পর অনেক জন শিশুকে

২০১৪ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার যেন এক আশ্চর্য বৃত্তকে সম্পূর্ণ করে। কৈলাস সারাজীবন ধরে চেয়েছেন শিশুদের বিকাশের আদর্শ পরিবেশ। সেই আদর্শ পরিবেশেরই যেন এক অগ্নিকন্যা মালালা।

উদ্ধার করে যখন গাড়িতে করে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, তখন একটা বাচ্চা মেয়ে তাঁদের প্রশ্ন করেছিল, 'কেন তোমরা আমাদের আরও আগে বাঁচাতে এলে না।' কৈলাস একটি ভাষণে বলেছেন, 'এই প্রশ্নের উত্তর আমি আজও দিতে পারিনি। তবে ব্রত নিয়েছি এই প্রশ্ন করার অবকাশ মুছে দেব। ভারতের হাজারটা সমস্যা আছে, কিন্তু আমাদের আনতে হবে লক্ষ সমাধান।'

শেষ করার আগে বলি, ২০১৪ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার কৈলাস সত্যার্থী ছাড়াও পান পাকিস্তানের মালালা ইউসুফজাই। এই নির্ভিক কিশোরী তাঁদের দেশের কিছু রক্ষণশীল, নারিবিদ্বেষী সংগঠন, যারা চায় মেয়েরা তিমিরেই থাকুক, স্কুলের পথ না মাড়াক— সেই ফতোয়াকে অগ্রাহ্য করার সাহস দেখিয়েছিলেন। বিনিময়ে জুটেছিল গুলি। ২০১৪ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার যেন এক আশ্চর্য বৃত্তকে সম্পূর্ণ করে। কৈলাস সারাজীবন ধরে চেয়েছেন শিশুদের বিকাশের আদর্শ পরিবেশ। সেই আদর্শ পরিবেশেরই যেন এক অগ্নিকন্যা মালালা। নোবেল শান্তি পুরস্কারের ভাষণে তাই আবেগ-আপ্লুত কৈলাস মালালাকে সম্বোধন করেন নিজের মানসকন্যা বলে। ভারত-পাকিস্তানের শীর্ষকর্তারা, যাঁরা নিয়মিত সীমান্তে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলছেন, আপনারা কি দেবেন না এর মূল্য? ■

আমাদের ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে গেলেন তিনি। তিনি লোধা-শবরদের মতো দলিত মানুষজনের হয়ে কথা বলবার সবচাইতে বিশ্বস্ত নাম। মহাশ্বেতা দেবী। অবহেলিত এবং পিছিয়ে পড়তে পড়তে যেসব শব্দ পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠীর নিভৃত সংলাপে আশ্রয় পেয়েছে, সেইসব শব্দ তাঁর গল্প আর চরিত্রগুলোকে নির্মাণ করেছে।

মহাশ্বেতার বাস্তবতা

একরাম আলি

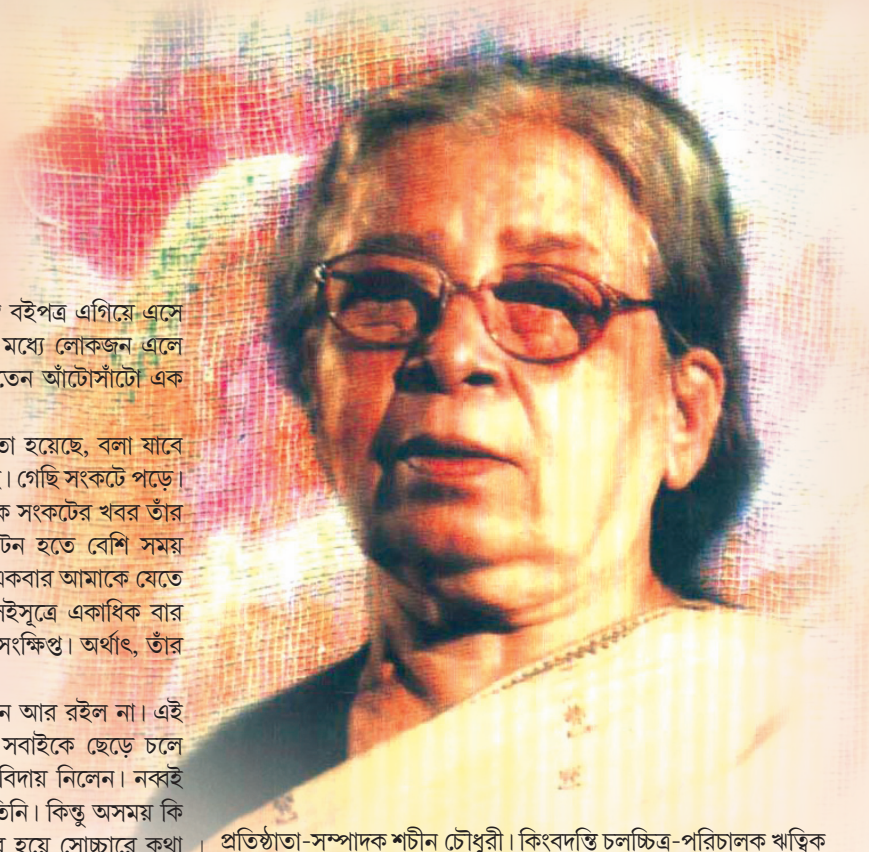

ফ্ল্যাটটা ছিল ছোট্ট। প্রতিটি দেওয়াল থেকে অজস্র বইপত্র এগিয়ে এসে আরও সংকীর্ণ করে ফেলেছিল ঘরগুলো। তারই মধ্যে লোকজন এলে বসার ঘরের ছোট্ট টেবিলে হাত রেখে তিনি বসতেন আঁটোসাঁটো এক চেয়ারে। উড়ো চুলে, নিতান্ত ঘরোয়া পোশাকে।

খুব বেশি বার যে এমন দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে, বলা যাবে না। যে-দু-একবার গেছি, ওইভাবেই তাঁকে দেখেছি। গেছি সংকটে পড়ে। বছর বারো আগের আমার নিতান্ত পারিবারিক এক সংকটের খবর তাঁর কানে যে কী করে পৌঁছেছিল, সে-রহস্য উদ্‌ঘাটন হতে বেশি সময় লাগেনি। যে-বন্ধু খবর দিয়েছিলেন, মহাশ্বেতাদি একবার আমাকে যেতে বলেছেন, আমার সেই শুভার্থীরই কাজ এটি। সেইসূত্রে একাধিক বার যাতায়াত। কথাও হয়েছে আঁটোসাঁটো, দরকারি, সংক্ষিপ্ত। অর্থাৎ, তাঁর স্বভাবমতো।

মহাশ্বেতা দেবীর নৈকট্য পাওয়ার উপায় এখন আর রইল না। এই সে-দিন, ২৮ জুলাই ২০১৬-য় তিনি আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন। বলা যাবে না যে, বড্ড অসময়ে তিনি বিদায় নিলেন। নব্বই পেরিয়ে, ব্যস্ততম জীবন কাটিয়ে, প্রয়াত হলেন তিনি। কিন্তু অসময় কি নয়? চারপাশের নীরবতা ভেঙে নিপীড়িত জনের হয়ে সোচ্চারে কথা বলবার মতো ক-জন আর রইলেন?

সেই কবে, ১৯২৬ সালের ১৪ জানুয়ারি, ঢাকা শহরে তাঁর জন্ম। যদিও তাঁদের পারিবারিক আবাসভূমি ছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গেরই পাবনা জেলা। এমন এক পরিবারে জন্ম, যে-পরিবারের, বলতে কী, প্রায় প্রতিটি সদস্যই সৃষ্টিশীলতার কোনো-না-কোনো ক্ষেত্রে বিখ্যাত। জগদ্‌বিখ্যাত? হ্যাঁ, এক-আধজন তেমনও। ফলে কাজের ভূত চেপে বসেছিল তাঁরও মাথায়।

বাবা মনীশ ঘটক 'কল্লোল' যুগের অতি পরিচিত লেখক। লিখতেন 'যুবনাশ্ব' ছদ্মনামে। মা ধরিত্রী দেবী আবার লেখক যেমন, তেমনই সমাজকর্মী। ধরিত্রী দেবীর ভাইয়েরা, অর্থাৎ মহাশ্বেতার মামারা ছিলেন নানা ক্ষেত্রে অতি বিশিষ্ট জন— যেমন ভাস্কর শঙ্খ চৌধুরী বা 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি অব ইন্ডিয়া'র, সংক্ষেপে 'ইপিডবলিউ'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শচীন চৌধুরী। কিংবদন্তি চলচ্চিত্র-পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের নাম আমরা সবাই জানি। তাঁর পরিচালিত 'বাড়ি থেকে পালিয়ে', 'অযান্ত্রিক', 'সুবর্ণরেখা', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' বা 'তিতাস একটি নদীর নামে'র কথা আমরা শুনেছি বা দেখেছি। ভারতীয় সিনেমায় তাঁর ভূমিকা বিপ্লবীর। নিজের সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রথা ভেঙে স্বকীয় প্রথা তৈরিই নয়, পুনে ফিল্ম ইনসটিটিউটের প্রধান থাকার সময় মণি কাউল, শ্যাম বেনেগালের মতো এমন একদল ছাত্র তৈরি করেন, যাঁরা মুম্বাইয়ে ফিল্ম পরিচালনায় নতুন এক ধারার নির্মাতা, যা 'নিউ ওয়েভ' নামে পরে বিখ্যাত হয়। এ হেন ঋত্বিক ঘটক ছিলেন তাঁর কাকা।

১৯৪৭-এ বিয়ে। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে, যিনি 'ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া'র, সংক্ষেপে 'আইপিটিএ'র মুখ্য প্রতিষ্ঠাতা।

তাঁদেরই ছেলে কবি ও ঔপন্যাসিক নবারুণ ভট্টাচার্য। অকালপ্রয়াত।

বাকি এক টাকায় তোর বাড়ি ফেরা হয়ে যাবে।

প্রথম উপন্যাস 'ঝাঁসির রানি' প্রকাশ পায় ১৯৫৬ সালে, যেটি লেখার জন্যে মহাশ্বেতা মধ্যপ্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘুরে তথ্য জোগাড় করেছিলেন। তখনই তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এই বোধে উপনীত হন যে, লিখিত ইতিহাসের থেকে মানুষের মুখের প্রচলিত ইতিহাস, নানা লোককথা, গান এবং বিশ্বাসের গুরুত্ব কম নয়।

প্রায় একশো উপন্যাস লিখেছেন মহাশ্বেতা দেবী। ছোটোগল্পের সংকলন কুড়িটি। সবই বাংলায়। কিন্তু তাঁর বহু লেখারই অনুবাদ হয়েছে মূলত ইংরেজি আর হিন্দিতে। বিখ্যাত উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক নিজেই অনুবাদ করেছেন মহাশ্বেতার বহু রচনা। এবং নিজের উৎসাহে সেগুলো দেশ-বিদেশে প্রচারের এবং পড়ার উদ্যোগও নিয়েছেন।

মহাশ্বেতা দেবীর প্রথম বই 'ঝাঁসির রানি'র কথা আগেই বলেছি। এ ছাড়া তাঁর আরও কয়েকটি বিখ্যাত বই 'অরণ্যের অধিকার', 'হাজার চুরাশির মা', 'অগ্নিগর্ভ', 'স্তনদায়িনী'। পেয়েছেন বহু পুরস্কার। দেশের সব চেয়ে বড়ো পুরস্কার জ্ঞানপীঠ যেমন পেয়েছেন, তেমনই পেয়েছেন র‍্যামন মাগসাইসাই পুরস্কার।

২

এ হেন মহাশ্বেতার শৈশব কেমন ছিল?

স্কুলজীবন শুরু হয় ঢাকায়। দেশভাগের গোলমেলে সময়ে তাঁদের পরিবার চলে আসে কলকাতায়। সেই ভয়ংকর দিনগুলোতেও তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হয়নি দিদিমার জন্যে। বাড়িতে সব ধরনের বই হাতে ধরিয়ে দেওয়া হত। বাছবিচার না-করেই। অতি ছোটো বয়সেই পড়ে ফেলেছেন বঙ্কিম। সে-পড়া কেমন ছিল? দিদিমা পড়া ধরতেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়তে দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন— একে অমাবস্যা, তায় মেঘাবৃতা রজনী ... মানে কী?

বাড়ির এমন পরিবেশ তাঁর মনোগঠনে প্রভূত সাহায্য করে। পরে বিশ্বভারতীতে যখন পড়তে যান, সেখানে আরেক খোলা হাওয়া। সেখানে তাঁর পড়ার বিষয় ছিল ইংরেজি। গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পর এমএ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কর্মজীবন শুরু হয় বিজয়গড় কলেজে। ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। পরে পেশা হিসেবে নানা বিচিত্র কাজ তাঁকে করতে হয়েছে। কিন্তু, তাঁর মনের কাজটি ছিল সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষজনকে লক্ষ করা। তাদের জীবন, স্বপ্ন, লড়াই, বঞ্চনার বোধ নিজের মধ্যে সঞ্চারিত করা। পরে এসবই এসেছে তাঁর সামাজিক কাজকর্মে যেমন, তেমনই সাহিত্যসৃষ্টিতে।

নিপীড়িত জনের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের লোধা এবং শবরদের সমাজে ঢুকে, তাদের উন্নয়নের জন্যে কাজ করা, দেশের দলিত-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া, ভুল শিল্পায়নের প্রতিবাদে সামিল হওয়া— এসবের মাঝে কখনো তিনি হারিয়ে ফেলেননি তাঁর লেখকসত্তাকে। বরং এইসবই মহাশ্বেতার লেখার বিষয় হয়ে গেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, এইসব সাধারণ মানুষই দেশের ইতিহাস তৈরি করে।

সমাজের পিছিয়ে-পড়া মানুষদের কথা ভাবা, তাদের জন্যে কাজ করা— এ-সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, স্বভাবটা তিনি পেয়েছেন বাবা মনীশ ঘটকের কাছ থেকে। বাবা বলতেন, তোর কাছে যদি এগারো টাকা থাকে, যার সত্যি দরকার তাকে দশ টাকা দিয়ে দে। ভাবিস না।

৩

সেই সত্তরের দশকের 'এক্ষণে' তাঁর 'দ্রৌপদী', 'স্তনদায়িনী' ইত্যাদি গল্পগুলি যখন বেরোচ্ছিল, তখন তাঁর মধ্যবয়স। তখন থেকেই বাঙালি পাঠকসমাজে তাঁকে নিয়ে হইচইয়ের শুরু। বলতেই হবে, তার আগের পর্বের লেখাগুলো ছিল কিছুটা উপেক্ষিত যেন-বা। সেসময় কোনো এক সমাগমে শঙ্খ ঘোষ (তাঁরই মুখে শোনা) সেইসব গল্পপাঠের মুগ্ধতার কথা বলায় মহাশ্বেতা দেবীর সোজাসাপটা উত্তর ছিল— আমি তো

তিনি ছিলেন স্পষ্টবক্তা। বরং বলা ভালো— ঠোঁটকাটা। তিনি ছিলেন সমাজকর্মী। পুরুলিয়ার অচ্ছুত শবরদের মা-বাবা যেমন, তেমনই মা বহু নকশাল-কর্মীর। এখন কেউ কেউ তাঁকে বলছেন— হাজার চুরাশির মা। মহাশ্বেতা দেবী নানা কারণে বিতর্কিতও। রাজনৈতিক মতপ্রকাশে বার বার শিরোনামে উঠে এসেছেন। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে তাঁর লেখকসত্তার উজ্জ্বল উত্তরীয়টি আমৃত্যু উড্ডীন থেকেছে।

বরাবর এইরকমই লিখি। আপনারাই পড়েননি।

হ্যাঁ। তিনি ছিলেন স্পষ্টবক্তা। বরং বলা ভালো— ঠোঁটকাটা। তিনি ছিলেন সমাজকর্মী। পুরুলিয়ার অচ্ছুত শবরদের মা-বাবা যেমন, তেমনই মা বহু নকশাল-কর্মীর। এখন কেউ কেউ তাঁকে বলছেন— হাজার চুরাশির মা।

মহাশ্বেতা দেবী নানা কারণে বিতর্কিতও। রাজনৈতিক মতপ্রকাশে বার বার শিরোনামে উঠে এসেছেন। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে তাঁর লেখকসত্তার উজ্জ্বল উত্তরীয়টি আমৃত্যু উড্ডীন থেকেছে। তুমুল কলকাতায় বসবাস করেও তিনি চেয়েছিলেন অরণ্যের অধিকার।

কাকা। ঋত্বিক ঘটক। চলচ্চিত্র পরিচালক।

স্বামী। বিজন ভট্টাচার্য। নাট্যকার।

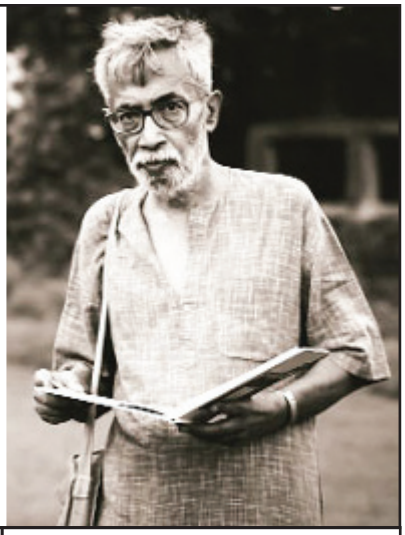

ছেলে। নবারুণ ভট্টাচার্য। কবি ও ঔপন্যাসিক।

১৯২৬ সালের ১৪ জানুয়ারি, ঢাকা শহরে মহাশ্বেতার জন্ম। যদিও পারিবারিক আবাসভূমি ছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গেরই পাবনা জেলা। এমন এক পরিবারে জন্ম, যে-পরিবারের, বলতে কী, প্রায় প্রতিটি সদস্যই সৃষ্টিশীলতার কোনো-না-কোনো ক্ষেত্রে বিখ্যাত। জগদ্‌বিখ্যাত? হ্যাঁ, এক-আধজন তেমনও।

এত খ্যাতি পেয়েছেন, যা সর্বভারতীয়, যে, তাঁর প্রতি ভারতবাসীর দায়িত্ব-কর্তব্য যেন শেষ। পাঠক হিসেবে আমাদের আর কোনো দায় নেই তাঁর লেখা পড়বার। তবু কেন পড়ব?

বাংলার সেরা রূপকথা-গ্রন্থটির একেবারে শেষে এসে শেষতম প্রশ্নটি ছিল, 'কেন রে সাপ খাস'। জিজ্ঞাসাচিহ্নহীন প্রশ্নটির উত্তরে, সম্ভবত খেতে খেতেই, সাপ বলেছিল, 'খাবার ধন খা'ব নি? গুড়গুড়ুতে যা'ব নি?'

আজ মৃত্যুর পরে তাঁর গল্পগুলো পড়তে পড়তে আমারও উত্তর তদ্রূপ। অর্থাৎ খ্যাতির বিভা (যদি থেকে থাকে) কোনো অতিরিক্ত আলো দিতে পারে না, খ্যাতির ক্লেদও (যদি থাকে) কোনো লেখাকে কলঙ্কিত করতে পারে না। লেখা, যা আগে থেকে তৈরি হয়ে আছে, তার নানান গুপ্ত কুলুঙ্গিকে আবিষ্কার করতে পারে শুধু নতুন নতুন পাঠক।

১৯৬২-৬৪ সালে একটা গল্প লিখেছিলেন মহাশ্বেতা। 'দেওয়ানা খইমালা ও ঠাকুরবটের কাহিনী'। আজ থেকে প্রায় অর্ধশতক আগের লেখা গল্পটির পটভূমি অষ্টাদশ শতকের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। ফের পড়তে গিয়ে দেখছি, দ্রুতগতির কাহিনি-বিন্যাসে, আখ্যানের প্রতি ভাষার বিস্ময়কর বিশ্বস্ততায় গল্পটি আবার আছড়ে পড়ল একেবারে আমাদের সামনে। এবং, সময় পেরিয়ে চলে যেতে চাইছে আরও সামনের দিকে, গল্পের দুই চরিত্র গোলক আর খইমালা যে-দিকে ভেসে গিয়েছিল।

বর্ণাঢ্য কাহিনি। গতির জন্যে বর্ণ আরও বেড়ে যায়। সে-বর্ণ কেমন? তিনি নেই। তাঁর রচনাকর্ম রয়ে গেছে। সেখান থেকে একটু উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না: 'সময় নেই, সময় কোথায়? এতক্ষণ মেঘে মেঘে বেলা চলে গিয়েছে। সূর্যের দাঁড়াবার সময় নেই, এখন সূর্য পশ্চিমে। সহসা মেঘ ভেঙে আকাশের কোণে কোণে গলগল করে লাল আলো উছলে পড়ল। সন্ধ্যার সূর্যের দৃষ্টি ঘোলাটে, দেখলে ভয় হয়। মতি শেখের ঘোড়া গাড়িসুদ্ধ খানায় পড়ে জখম হলে, আর বাঁচবে না জেনে, মুচিরা এসে জীয়ন্তে চামড়া টানবে জেনে, "ওরে, এমন নিদয় কাজ করতে আমার কলজা ফাট্টে যায়" বলে কাঁদতে কাঁদতে মতি শেখ সে ঘোড়াকে জবাই করেছিল। মানুষ সেজন্য তাঁকে আজও নির্দয় বলে, কিন্তু পোষা জীবের অমন কষ্ট কে দেখতে পারে? ঘোড়ার চোখের দৃষ্টি নিমেষে ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল, গলার সফেন রক্ত অমনি গলগলিয়ে চতুর্দিকে বয়ে গিয়েছিল।'

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল। আসলে নিম্নবঙ্গের গল্পটি পাঠকের সামনে তার জল-কাদা-বৃক্ষরাজি-মানুষ-প্রাণীকুল-কল্পনা-মায়া-রিরংসা সমেত উপস্থিত করতে পারলে তৃপ্তি হত। সেই অতৃপ্তি থেকেই মনে পড়ছে মার্কেজের 'সরলা এরেন্দিরা'র কথা। দেশ-জাতি-ধর্ম-ইতিহাস এবং তার মৃত্তিকাসঞ্জাত গাছপালা আর সমাজবিন্যাস, অর্থনীতি আর নদীস্রোত, কলাঝোপ আর সূর্যাস্ত-সহ 'সরলা এরেন্দিরা' যেভাবে নির্মিত হয়েছিল দূর লাতিন আমেরিকায়, প্রায় সমকালেই (আঙুল গুনে বললে, বছর দশেক আগেই) মহাশ্বেতা দেবীর 'দেওয়ানা খইমালা ও ঠাকুরবটের কাহিনী'র নির্মাণে তার সঙ্গে একটা পদ্ধতিগত যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

এ এক আশ্চর্য যোগাযোগ! কুড়ি শতকের মাঝামাঝি নিরাসক্ত, আত্মসর্বস্ব, বিচ্ছিন্ন এবং বহিরাগত (যেন এলিয়েন! এই ধারণাটির জন্ম এমন এক আত্মগর্ব থেকে, যা দীর্ঘদিন কালো আর বাদামিদের শোষণ করার পর সাধারণের স্তরে নেমে আসার সংকটের সঙ্গে সম্পৃক্ত।) তৎকালীন

সরকারি গান-স্যালুটে শেষ বিদায় জানানো হল মহাশ্বেতা দেবীকে। তবু এই বাক্যটি অসার হওয়ার নয় যে, তিনি সেই বিরল লেখকদের একজন, যিনি নিপীড়িত জনের বাস্তবতাকে দেখতে পেয়েছিলেন আর মধ্যবিত্তদের চোখে যতই অলীক মনে হোক, সাহিত্যে সেই বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেলেন।

ইউরোপের একক জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে পরাজয়জনিত যে-বমিবমি ভাব, সেসবের থেকে দূরে নিজের দেশ আর সেই দেশের ভাষা ও তার ভবিষ্যৎকে আবিষ্কারের চেষ্টাই সম্ভবত নৈকট্য এনে দিয়েছে 'দেওয়ানা খইমালা ও ঠাকুরবটের কাহিনী' আর 'সরলা এরেন্দিরা'র মধ্যে।

আজ তাঁর প্রয়াণের পর প্রতিবাদ করতেই হয় তাঁদের, যাঁরা মনে করেন, আঞ্চলিক ভাষার সংলাপ লেখার চেষ্টা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। কী অসম্ভব বিশ্বস্ততায় মহাশ্বেতা সংলাপে আর দু-এক লাইনের বর্ণনায় জীবন্ত করেছেন চরিত্রগুলোকে, ভাবা যায় না! বিস্তৃত, অবহেলিত এবং পিছিয়ে পড়তে পড়তে যেসব শব্দ পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠীরও নিভৃত সংলাপে আশ্রয় পেয়েছে, সেইসব শব্দ তাঁর গল্প আর চরিত্রগুলোকে নির্মাণ করেছে।

আর চরিত্রগুলি? তারা কোমল, তারা রুক্ষ, ধূলিমলিন। তাদের শৌর্যে আকাশের পর্দা ফেটে যায়। তাদের বঞ্চনায় শানের ওপর অবিরাম খোলামকুচি ঘষার কর্কশ আওয়াজ।

এইসব চরিত্র পাঠকের মধ্যবিত্ত আপাত-নিশ্চয়তার জগতে বেমানান। ফলে, অবাস্তব। আর, এইখানেই এদের জোর। এই স্বভূমিতেই এদের বাস্তবতা।

সরকারি গান-স্যালুটে শেষ বিদায় জানানো হল মহাশ্বেতা দেবীকে। তবু এই বাক্যটি অসার হওয়ার নয় যে, তিনি সেই বিরল লেখকদের একজন, যিনি নিপীড়িত জনের বাস্তবতাকে দেখতে পেয়েছিলেন আর মধ্যবিত্তদের চোখে যতই অলীক মনে হোক, সাহিত্যে সেই বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেলেন। ■

উল্লেখযোগ্য পুরস্কার ও সম্মান

১৯৭৯: সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার ('অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের জন্যে)।
১৯৮৬: পদ্মশ্রী সম্মান।
১৯৯৬: জ্ঞানপীঠ পুরস্কার।
১৯৯৭: ম্যাগসাইসাই পুরস্কার (ফিলিপাইন)।
২০০৩: অফিসার অব দ্য অর্ডার দেস আর্টস দেস লেটারস (ফরাসি সরকারের দেওয়া)।
২০০৬: পদ্মভূষণ সম্মান।
২০০৭: সার্ক সাহিত্য পুরস্কার।
২০০৯: ম্যান বুকার পুরস্কারের জন্য শর্ট লিস্টেড।
২০১০: যশবন্তরাও চবন জাতীয় পুরস্কার।
২০১১: বঙ্গভূষণ (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সর্বোচ্চ সম্মান)।

চলে গেলেন মহম্মদ আলি। শতাব্দীর সেরা খেলোয়াড়। শুধু খেলোয়াড়ই ছিলেন না— তাঁর কিছু বলার ছিল, কিছু করারও ছিল। এবং দুটোই তিনি করেছেন। বর্ণবিদ্বেষের প্রতিবাদে ওহাইয়ো নদীর জলে ছুড়ে ফেলেছেন অলিম্পিকের স্বর্ণপদক। যুদ্ধের বিরোধিতা করতে গিয়ে খুইয়েছেন খেতাব। তবু তাঁর প্রতিভা আর জনপ্রিয়তা তাঁকে করেছে রিঙের রাজা।

রিংয়ের রাজা মহম্মদ আলি

অনুরূপ ভৌমিক

তাঁর কিছু বলার ছিল, তাঁর কিছু করারও ছিল। এবং দুটোই তিনি করেছেন মর্জিমতো। যেভাবেই করুন, সবসময় মাধুর্যে ভরা ছিল, মানুষকে মুগ্ধ করার মতো ছিল। অথচ প্রথম যখন মহম্মদ আলির কথা শুনি, তেমন আপ্লুত হইনি। তাঁর সব কথায় বড়ো আমি-আমি ভাব। অসাধারণ কথা বলেন বটে, তবে সবই যে অন্যকে ছোটো করার জন্য, নতুন নতুন উপায়ে অন্যদের অপমান করে আনন্দ পান— এ কেমনতরো মানুষ। কেমন মানুষ যিনি বলেন, আমি সেরা, আমিই সেরা। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ ও রুচিতে ধাক্কা লাগত। তখনও সংবাদমাধ্যম এত জোরদার হয়নি, তখন টেলিভিশন চ্যানেল এত ভীষণভাবে আমাদের হেঁশেলে ঢুকে পড়েনি। তবু পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে মহম্মদ আলির বিবরণ আমাদের আধাশহরে পৌঁছেছিল। খবরের কাগজের আবছা ছবিতে (তখন ছাপাছাপি এত সুন্দর ছিল না) দেখলেই চিনতে পারতাম মানুষটাকে। তাঁর পায়ের কাছে অসহায়ভাবে পড়ে থাকত কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী, মহম্মদ আলির গ্লাভসপরা হাত তখনও সতর্ক, বিস্ফারিত মুখে আত্মপ্রশংসার চিৎকার আমাদের কানে পৌঁছোত নিউজপ্রিন্ট ভেদ করে। আর কোনো বক্সার আমাদের জীবনে ছিল না, মহম্মদ আলিকে শোনা ও দেখার আগে বক্সিং সম্পর্কে আগ্রহই ছিল না। যেটুকু আগ্রহ, তা খেলার বাইরের কারণে। ১. তিনি কৃষ্ণাঙ্গ এবং অবহেলিত শ্রেণির এক চ্যাম্পিয়ন। ২. তিনি রিংয়ে যতই মারামারি করুন-না-কেন, আসলে শান্তিপ্রিয় মানুষ। ক্যাসিয়াস ক্লে থেকে তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে মহম্মদ আলি হন যুদ্ধ-বিরোধিতা করতে। দাসপ্রথা থেকে জন্ম নেওয়া নামকরণের লেখা মুছে ফেলতে। এই দুটো কারণই ছিল ক্যাসিয়াস ক্লে থুড়ি, মহম্মদ আলিকে ভালোবাসার পক্ষে যথেষ্ট। ফলে, আপাত-দাম্ভিক ও কথা বলা পুতুল বক্সারকে আমার মতো অনেকেই ভালোবেসে ফেলেছিল। তার সঙ্গে খেলার তেমন সম্পর্ক নেই। বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদের একটা মুখ পাওয়া গেছে। সব-হারানোদের অনেক কিছু না থাকলেও, একটা আলি তো আছে।

বয়স বাড়লে মানুষের মুগ্ধতা কমে, বিচারবোধ বদলায়। কিন্তু, যুবক হওয়ার পর দেখা গেল পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হওয়া সত্ত্বেও পেলে আর মানুষ হিসেবে তেমন আকর্ষণীয় নেই। তাঁর জীবন মাঠের কারিকুরিতেই শেষ। কিন্তু, মহম্মদ আলি সম্পূর্ণ আলাদা। যত বয়স বাড়ে তত ছেয়ে বসছেন মন জুড়ে। তারপর ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কল্যাণে দেখার সৌভাগ্য হল আমাদের লালচে নিউজপ্রিন্টের সেই স্থিরচিত্রগুলির সচল হয়ে ওঠা। এ যে জ্যান্ত আলি। একের পর এক লড়াই দেখি, তাঁর চড়া ভাষণ শুনি, সাক্ষাৎকার দেখি আর শ্রদ্ধা বেড়েই

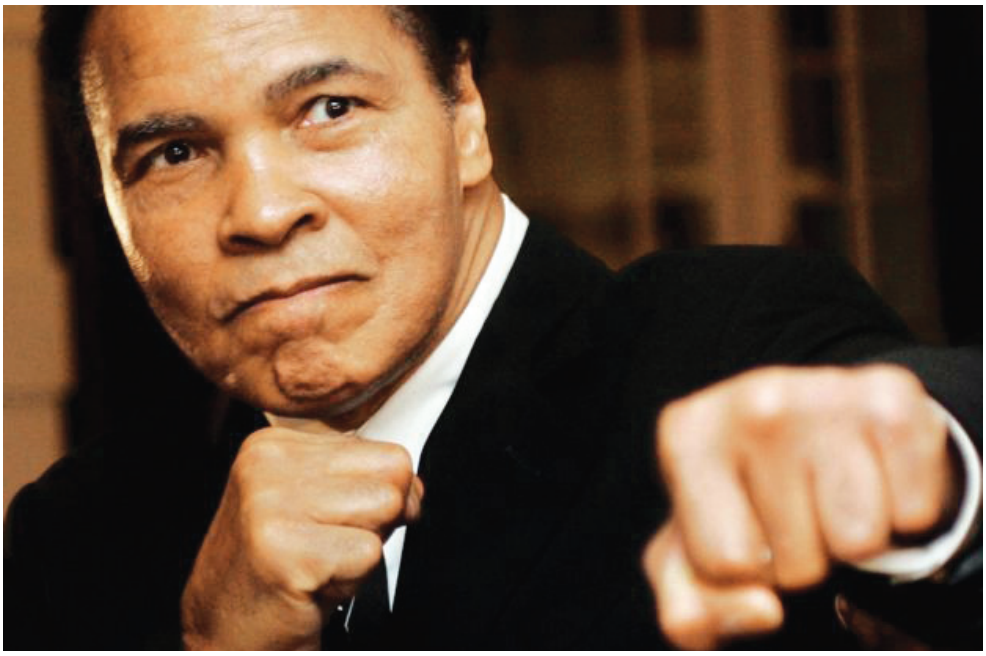

একের পর এক লড়াই দেখি, তাঁর চড়া ভাষণ শুনি, সাক্ষাৎকার দেখি আর শ্রদ্ধা বেড়েই চলে। বক্সিংয়ের মতো এক জান্তব মানুষ পেটানোর খেলা যে এত সুন্দর হতে পারে জানা ছিল না।

চলে। বক্সিংয়ের মতো এক জান্তব মানুষ পেটানোর খেলা যে এত সুন্দর হতে পারে জানা ছিল না। সত্যিই তো, এ যে প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়ানো এবং বোলতার মতো হুল ফোটানো। আর সব বক্সার মারপিট করতে আসে, আলি নাচের তালে রিংয়ে উড়ে উড়ে শূন্যে অনেক আলপনা আঁকলেন, তারপর প্রতিদ্বন্দ্বী পড়ে গেলেন মেঝেয়। এমন কাণ্ড আগে কখনো দেখা যায়নি। বহু বছরের দেখাদেখি থেকে বলতে পারি— আর দেখাও যাবে না। এ একা আমার বিশ্বাস নয়, এক মুগ্ধ ভক্তের বেশি কী-ই-বা আমি, কিন্তু পৃথিবীর মহাপণ্ডিতরাও এই একটি বিশ্বাসে আমার পথের অন্ধ পথিক। ১৯৯৬ আটলান্টা অলিম্পিকে উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে মশালস্তম্ভ জ্বালতে দেখা যায় মহম্মদ আলিকে। ১৯৯৯ সালে বিবিসি তাঁকে শতাব্দীর সেরা ক্রীড়া-ব্যক্তিত্ব নির্বাচিত করে। পৃথিবীজোড়া ভোটের মাধ্যমে বাছা হয়েছিল। মনে রাখতে হবে, বহু ভোটার ছিল তরুণ, যারা আলির প্রজন্মের উন্মাদনা বা লড়াইয়ের শরিক নয়। কিন্তু, আলির ক্যারিশমা বা মনোমোহিনী আকর্ষণ ক্ষমতা এমন যে, প্রজন্ম ও বয়সের সীমানা বাধা হয়নি। পৃথিবীর অন্যতম সেরা খেলার পত্রিকা 'স্পোর্টস ইলাসট্রেটেড' সেই ১৯৯৯ সালেই আলিকে শতাব্দীর সেরা খেলোয়াড় ঘোষণা করে। এই পত্রিকায় মহম্মদ আলির প্রচ্ছদ হয়েছিল আটতিরিশ বার, যা কিনা একমাত্র বাস্কেটবলার মাইকেল জর্ডনের চেয়ে কম। কথা হল, যাঁর সবচেয়ে বেশি, সেই বাস্কেটবলারটিকে শতাব্দীর সেরা করা হল না কেন? করা মুশকিল, কারণ, প্রচ্ছদে কার ছবি যাবে, তা সম্পাদকীয় দপ্তর ঠিক করে, কিন্তু শতাব্দীর সেরা তো মানুষের হাতে। মানুষের বিচারে আলির চেয়ে বড়ো আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব খেলার জগতে আসেননি। কেননা, আলি নিজেকে খেলার জগতে সীমাবদ্ধ রাখেননি। নিগ্রোদের (তখনও আফ্রিকান আমেরিকানদের সম্মান দেওয়া হত না) বেঁচে থাকার স্বপ্ন, শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের বিরোধিতা এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের হয়ে আফগানিস্তানে জরুরি শান্তিপ্রস্তাব— সর্বত্র আলি বিচরণ করেছেন প্রজাপতির মতো সৌন্দর্যে, বক্সিং রিংয়ের হুলটি ছিল অনুপস্থিত। পারকিনসন্স নড়াচড়া সীমিত করে দিলেও হৃদয় কোথাও থেমে ছিল না।

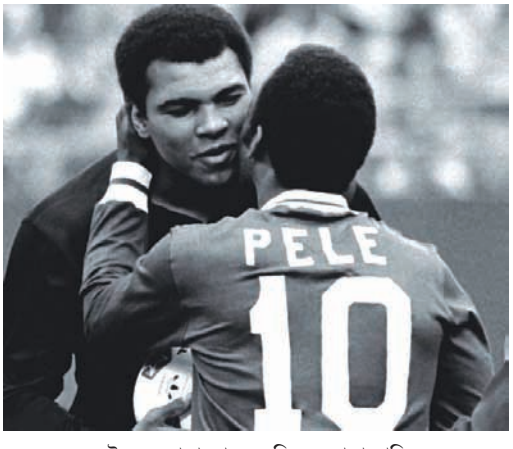

ফুটবলের রাজা পেলে ও রিংয়ের রাজা আলি।

এই পত্রিকার অনেক পাঠক-পাঠিকা মহম্মদ আলির নামে পরিচিত হলেও তাঁর মহিমা বুঝতে পারবেন না। অনেক দিনের কথা, অনেকরকম নতুন হইচই এসে গেছে। তাই সদা শ্রদ্ধেয় গত শতাব্দীর সেরা ক্রীড়া-ব্যক্তিটির শুরুর দিকে একটু ফিরে তাকানো যাক।

১৯৪২ সালে ১৭ জানুয়ারি জন্ম ক্যাসিয়াস মার্সেলাস ক্লে (সিনিয়র) ও ওডেসা গ্ল্যাডি ক্লের প্রথম পুত্র জুনিয়র ক্যাসিয়াস ক্লের। বক্সিংয়ে আসাটা ঘটনাচক্রে। বারো বছর বয়সে প্রিয় সাইকেলটা চুরি হয়ে যেতে জুনিয়র ক্যাসিয়াস লুইভিল থানায় অফিসার জো মার্টিনের কাছে নালিশ জানায়। শুধু ধরলে হবে না, অপরাধীকে পেটাতেও হবে। মার্টিন নিজে ছিলেন বক্সিংয়ের ট্রেনার। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে, এ-ছেলের মধ্যে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। মার্টিন বলেন, আগে লড়তে শেখো তারপর পেটাবে দোষীকে। সেই শুরু ট্রেনিং। ছ-সপ্তাহ ট্রেনিংয়ের পর ক্যাসিয়াস জীবনের প্রথম লড়াইয়ে নামেন ও জেতেন। সিদ্ধান্তে সব বিচারক এক-মত না হলেও তিন জন ছিলেন ক্লের পক্ষে। আঠারো বছর বয়সে পৌঁছোনোর আগে ক্যাসিয়াস দু-বার জাতীয় গোল্ডেন গ্লাভস টাইটেল পেয়ে যান, দু-বার কবজায় আসে অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ইউনিয়নের ন্যাশনাল খেতাব। ওই ক-বছরে লড়া হয়ে গেছে একশো লড়াই, যার মধ্যে বিরানব্বইটায় জয়। হাই স্কুল পেরোনোর পর ১৯৬০-এর গ্রিসে রোম অলিম্পিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দলে জায়গা হয়। তখন গোঁফের রেখায় ছ-ফুট তিন ইঞ্চির যুবক আর তুমি বলার জায়গায় নেই। রীতিমতো সমীহ করা হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম সেরা বক্সিং প্রতিভা বলে। তাঁর ঘুসির গতি বোঝা যায় না, তাঁর পা চলে নর্তকীর ক্ষিপ্রতায়— বাঁধাধরা পাশবিক কিছু নেই, তবু লুটিয়ে পড়েছে প্রতিদ্বন্দ্বীরা। প্রথম অলিম্পিকেই লাইট হেভিওয়েটে তিনি সোনা জেতেন পোল্যান্ডের বক্সার জিগনিউ পিয়েত্রিকোস্কিকে হারিয়ে। দেশে ফেরার পর নায়কের সম্মান পেলেও দমে গেলেন, বলা যায়, চূড়ান্ত

অপমানিত হলেন লুইভিলের এক রেস্তরাঁয় গিয়ে। ব্রিটিশ আমলে আমাদের দেশে বহু জায়গায় লেখা থাকত 'ইন্ডিয়ানস অ্যান্ড ডগস্ আর নট অ্যালাওড'। লুইভিলের রেস্তরাঁটি ছিল সেরকম। কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গদের জন্য। তখনও আমেরিকার বহু অংশে বর্ণবিদ্বেষ নির্লজ্জভাবে সক্রিয়। দেশের হয়ে পাওয়া অলিম্পিকের সোনার পদক ছুড়ে ফেলে দেন ওহাইয়ো নদীর জলে। দেশের হয়ে লড়ার আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে পেশাদার বক্সিং-জীবন শুরু করেন। সে-বছর ক্যাসিয়াস ক্লে উনিশটি লড়াই লড়ে প্রতিটিতে জেতেন।

১৯৬৪ সালে বয়স যখন বাইশ, ধারাবাহিক জয়ের ফলে তিনি সুযোগ পান হেভিওয়েট বিভাগের বিশ্বখেতাবের লড়াইয়ে নামার। প্রতিদ্বন্দ্বী সনি লিস্টনকে শরীর ও শক্তির কারণে তখন ডাকা হত 'দ্য বিগ বিয়ার' বলে। লিস্টনের লড়াইয়ে না ছিল সৌন্দর্য, না ছিল প্রথাগত নিয়মকানুন বা সভ্যতা। প্রতিদ্বন্দ্বীকে পিষে ফেলা বুলডোজারের মতো— এ-ই ছিল বক্সিংয়ের মানে। ক্লে-র আগে তাঁর পেশাদার রেকর্ড ৩৫-১। অর্থাৎ ছত্তিরিশটা লড়ে হার মাত্র একটায়। বাইশ বছরের তরুণ চ্যালেঞ্জারের অবশ্য ভয়ডর বলে কিছু ছিল না। লড়াইয়ের আগের পর্বে অপমানের তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে অস্থির করে তুলেছিলেন লিস্টনকে। লিস্টনের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। তাল কাটা অন্ধ বাঘের মতো ক্লে-র কাছে ষষ্ঠ রাউন্ডে নক আউট হয়ে যান। ওই একটা লড়াই হেভিওয়েট বক্সিং জগতে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। বক্সিং শুধু শারীরিক শক্তির প্রকাশ নয়, আদিম মুষ্ঠিযুদ্ধ নয়, নয় টাকার তাড়নায় অন্যকে পিষে ফেলার ইচ্ছে। দেখা গেল বিড়ালের ক্ষিপ্রতা, চিতার গতি এবং মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়েও দক্ষ হতে হবে। ক্যাসিয়াস ক্লে-র মধ্যে এর সব ক-টাই ছিল সহজাতভাবে, অনুশীলনে তা আরও পরিপক্ক হয়। তিনি দু-হাত দিয়ে সবসময় মুখ ঢেকে লড়তেন না, লড়াইয়ের সময় প্রতিপক্ষের সঙ্গে টানা আক্রমণাত্মক কথা বলে চলতেন তাকে উত্তেজিত করে পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে।

গত শতকের ছয়ের দশকের শুরু থেকে জুনিয়র ক্লে-র সেই যে যাত্রা শুরু হয়, তা রিংয়ে একুশ বছর গড়ালেও কার্যত চলেছে সারাজীবন। রিংয়ে জিতে তিনি ভোগবিলাসে সময় শেষ করতেন না। বক্সিং রিং তাঁর কাছে জীবনের এমন একটা অংশ, যেখানে জীবনের বাকি অংশের লোভ, অপ্রাপ্তি এবং অভিযোগ উশুল করে নিতেন। সনি লিস্টনের সঙ্গে লড়াইয়ের আগে ট্রেনিং-পর্বে ক্লে দেখা করেন ম্যালকম এক্সয়ের সঙ্গে। ম্যালকম এক্স তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গদের অবিসংবাদী নেতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে 'নেশন অব ইসলামে'র মুখপাত্র। লিস্টনকে হারানোর পর ক্যাসিয়াস ক্লে

মহম্মদ আলি শুধু বক্সার নন, বর্ণবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে তাঁর কথা আছে, অনৈতিক যুদ্ধে তাঁর আপত্তি আছে, তার জন্য নিজের কেরিয়ার গোল্লায় গেলে যাক।

নাম বদলে হন ক্যাসিয়াস এক্স। পরে, নেশন অব ইসলামের নেতা এলিজা মহম্মদ নাম বদলে করেন মহম্মদ আলি। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বক্সার বলেছিলেন, যাক, এই নাম শেষ পর্যন্ত দাসপ্রথা থেকে জন্ম নেওয়া থেকে মুক্তি দিল। আলির কাছে ধর্মান্তরিত হওয়াটা শুধু নতুন ধর্মের প্রতি আস্থা দেখানো নয়, ছিল কৃষ্ণাঙ্গদের ক্রীতদাসত্বের বোঝা ঝেড়ে ফেলাও।

১৯৬৫-তে আলি আবার লড়েন লিস্টনের সঙ্গে। এবার লিস্টনের পরিণতি হয় আরও করুণ। দু-মিনিটও টেকেনি সে-লড়াই। লিস্টনের সংজ্ঞাহীন বিশাল দেহ পড়ে ছিল আলির পায়ের কাছে। এই ছবিটা বক্সিংয়ের ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত ছবিগুলোর একটা।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় অবশ্য আলি বাড়তি সুবিধা পাননি দেশের কাছে। তখন ভিয়েতনামের জঙ্গলে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা। ১৯৬৭ সালে আলিকে যুদ্ধে পাঠানোর জন্য বাছা হয়। আলি রাজি হননি। তাঁর বক্তব্য ছিল

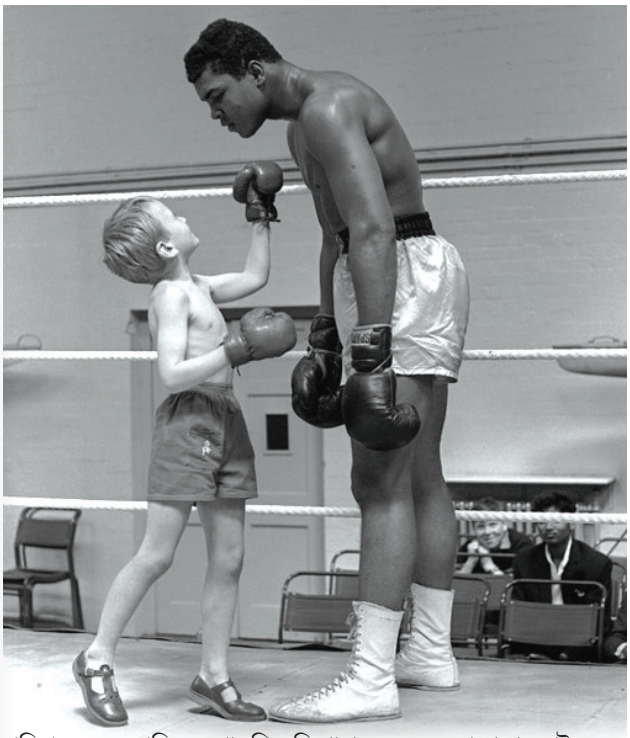

পরিষ্কার: কেন আমি ও তথাকথিত নিগ্রোরা ঘর ছেড়ে দশ হাজার মাইল দূরে বোমা ফেলতে যাব? কেন যাব বুলেটবর্ষণ করতে সরল ও অসহায় বাদামি মানুষদের ওপর? সেইসব মানুষ তো অপরাধ করেনি। তারা কখনো আমাদের বিরক্ত করেনি। আমি যাব না যুদ্ধে, আবার বলছি কোনোমতেই যাব না। জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট জানায়, আলির আপত্তির মধ্যে ধর্মীয় গন্ধ নেই, তা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। আলির আপত্তি নস্যাৎ করে শাস্তির ব্যবস্থা হয়, কেড়ে নেওয়া হয় তাঁর খেতাব এবং জানানো হয় সাড়ে তিন বছর তিনি লড়তে পারবেন না। তখন এ নিয়ে বিশ্বজোড়া যে-বিতর্ক হয়েছিল, তাতে আলির খ্যাতি ও ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়। মহম্মদ আলি আর শুধু বক্সার নন, বর্ণবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে তাঁর কথা আছে, অনৈতিক যুদ্ধে তাঁর আপত্তি আছে, তার জন্য নিজের কেরিয়ার গোল্লায় গেলে যাক। 'এস্কুইয়ার' পত্রিকার প্রচ্ছদে আলির ছবি বেরোয় শহিদ সেন্ট সেবাস্ত্রিয়ান সাজিয়ে। ১৯৬৮ সালে পাবলিক টিভি স্টেশন ডব্লিউএনইটি (WNET)-তে সাক্ষাৎকারে আলি বলেন, 'জেলকে আমি ভয় পাই না। আমি আল্লায় বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি এলিজা মহম্মদ আল্লার দূত। পৃথিবীতে অনেক মহান মানুষ জেলে গেছেন, সুতরাং জেল নিয়ে ভেবে লাভ নেই। যেতে হলে যাব।'

মহম্মদ আলির লড়াই নিয়ে বেশি কিছু বলা অর্থহীন। আমি কেন, পৃথিবীর তামাম দর্শক গুণমুগ্ধ ভক্তের মতো অনড় বসে দেখেছে। হাততালি দিতেও ভুলে গেছে। একুশ বছরের পেশাদার জীবনে ছাপ্পান্নটা লড়াইয়ে তিনি জিতেছেন। তিন-তিন বার বিশ্বখেতাব হারিয়ে আবার তিনি ফিরে পেয়েছেন। তাঁর জীবনের সেরা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অবশ্যই জো ফ্রেজিয়ার ও জর্জ ফোরম্যান। এমন বক্সিং— এমন প্রতিদ্বন্দ্বীতা পৃথিবীতে কমই দেখা গেছে। সেসবের বর্ণনা দিয়ে এ-লেখা ভারী করা অর্থহীন। কেননা, আলি আমার কাছে পৃথিবীর সর্বকালের সেরা বক্সার হলেও, সেটা প্রধান বিবেচ্য নয়। বক্সিং দক্ষতায় জো লুই বা আরও কেউ হয়তো তুলনায় আসবেন। আগ্রাসী রেকর্ডের বিচারে রকি মার্সিয়ানোও জবর লড়াইয়ে আসবেন। কিন্তু, মহম্মদ আলি আমার কাছে শুধু বক্সার নন। তিনি খেলার চেয়েও বড়ো। খেলার বাইরেও একজন মানুষের অস্তিত্ব কতদূর প্রভাব ছড়াতে পারে, তা মহম্মদ আলির মতো আর কাউকে দেখা যায়নি। তার মাত্র ৬১ (৫৬ জয়, ৫ পরাজয়) লড়াই রিংয়ে, তারচেয়ে

বহু বহু গুণ বেশি লড়াই হয়েছে পৃথিবীর নানান ধরনের রিংয়ে। তার কিছু দেখা যায়, কিছু দেখা যায় না। যেমন, তাঁর পার্কিনসন্স অসুখের সঙ্গে লড়াই। বক্সিং-জীবনে এত মার আলি খেয়েছেন (এর অনেকটা তার কেউসনের মধ্যে পড়ত। যেমন, রোপ-এ-ডোপ।) যার কিছু আঘাত মস্তিষ্কের অনেকাংশ বিকল করে দিয়েছিল। ১৯৭৯ সালে প্রাথমিক অবসরের পর আবার রিংয়ে ফেরাটা সম্ভবত আলির পক্ষে বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়। গিয়ে হারেন তাঁর প্র্যাকটিসের সঙ্গী ল্যারি হোমসের কাছে। টেকনিক্যাল নক আউট। তিনি এত মার খেয়েছিলেন যে পড়ে না গেলেও রেফারি লড়াই থামিয়ে দিতে বাধ্য হন। দু-বছর পর ১১ ডিসেম্বর ১৯৮১-তে উনচল্লিশ বছর বয়সে আলি আবার ফেরার চেষ্টা করেন। তখন তাঁর গতি কমে গেছে, রিফ্লেক্স নেই— দশম রাউন্ডে ট্রেভর বারবিক তাঁকে হারান। এরপর আলি আর চেষ্টা করেননি। কিন্তু ততদিনে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে যায়। ১৯৮৪ সালে ধরা পড়ে আলির পার্কিনসন্স সিন্ড্রোম। এ এমন এক অসুখ, যার চিকিৎসা নেই। বড়োজোর সর্বনাশ একটু মন্থর করা যায়। আলির ক্ষেত্রে গিয়েছিল কি না বোঝার উপায় নেই। হয়তো কিছুটা গিয়েছিল। কেননা, আলির অসুখ ধরা পড়ে মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে। পার্কিনসন্স, অ্যালঝাইমার সাধারণত বেশি বয়সের অসুখ। রিংয়ের ঝড়ঝাপটা সামলাতে গিয়ে এত অ্যাডভেঞ্চার আলি করে ফেলেছিলেন যে, সর্বনাশ বড্ড তাড়াতাড়ি এসে যায়। তবে তারপরও আলি বেঁচেছিলেন বত্তিরিশ বছর। শেষের কিছু দিনের সম্পূর্ণ স্মৃতি হারানো অবস্থা ছাড়লে, তাঁর একটা দিনও তিনি নষ্ট করেননি। অসুখ তাঁকে শ্লথ করে দিয়েছিল, তাঁর হাত ও ঘাড়-মাথা কাঁপত স্প্রিংয়ের পুতুলের মতো। কিন্তু মস্তিষ্ক সজাগ ছিল। তাঁকে অন্যায়ভাবে, চরিত্রবিরোধী কোনো কাজের দিকে ঠেলে দেওয়া যায়নি। না ইসলামের বিরুদ্ধে, না যুদ্ধের পক্ষে। না অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে, না গরিব দেশে বোমাবর্ষণের অজুহাতের শিখণ্ডীরূপে। ২০১৬ সালের ৩ জুন মৃত্যু হয় আমার প্রিয়তম খেলোয়াড় মহম্মদ আলির। যিনি সব খেলাকে ছাপিয়ে খেলার চেয়েও বড়ো হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এ তো গেল বিচার-বিবেচনা বা বিশ্লেষণের চেষ্টা। কোনো মহান খেলোয়াড়ের মৃত্যুতে ব্যক্তিগতভাবে আমার শরীরে অজানা কোনো শিহরন হয়নি কখনো। সেই শিহরনের ভূমিকার কথা বলি। এ ব্যক্তিগত হলেও, এবার হয়তো বলা যায়। মাস তিনেক তো কাটল। মন কতদিনই-বা খারাপ থাকে।

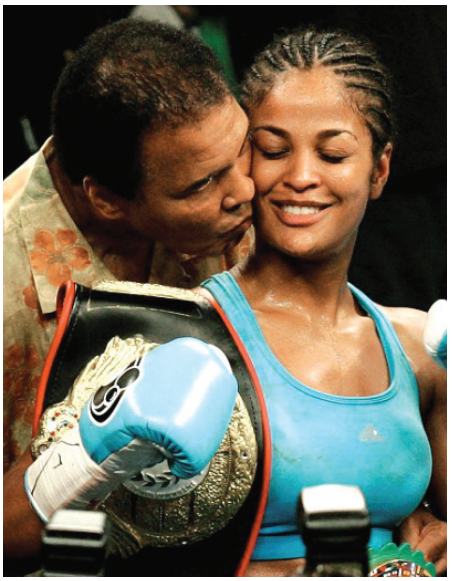
বক্সার-মেয়ের সঙ্গে।

কলকাতায় শীতেও আর তেমন শীত পড়ে না। কমে কয়েক দিন কবে কাছে আসবে, তার আশায় শীতবস্ত্র সাজিয়ে অপেক্ষা করতে হয়। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরের শেষটা ছিল রহস্যময়। অন্তত আমার জন্য, হয়তো-বা একমাত্র আমারই জন্য। অসুখবিসুখ নেই, তবু সোয়েটার গায়ে দিলে ঠান্ডা লাগে, বুক হাট-করা জামা পরে গরম বোধ হয়। আশপাশের লোকদের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে হতাশ হলাম, সবাই স্বাভাবিক শেষ ডিসেম্বরের নিয়ম মেনে। বিচিত্র ভৌতিক কাণ্ড শুধু আমারই শরীরে ঘটছে। দু-দিন আগে ভোরের কুয়াশায় বেরিয়ে ছাপ্পান্ন ঘণ্টা পর কলকাতা বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জের ঠান্ডা ঘরে বসে বুঝতে পারি আমার শরীরের বিচিত্র আচরণের কারণ মন, এবং আমার মনের দিশেহারা উচাটন ভাবের উৎস জোগায় আমার গায়ে ক্লাস সেভেনের বন্ধুর মতো সেঁটে থাকা ছ-ফুট তিন ইঞ্চির মানুষটি। সে-মানুষের নাম যদি মহম্মদ আলি হয়, যদি তিনি আপনার কাঁধে হাত দিয়ে হাসি-হাসি মুখে প্রশ্ন শোনেন, তাহলে এমন হতেই পারে। শরীরে রাসায়নিক ও ভৌত পরিবর্তন ঘটতে পারে। আমারও ঘটেছিল। দু-দিন ধরা দিতে গিয়েও ফসকে গেছেন অল্পের জন্য, সাক্ষাৎকারের সুযোগ ঘটেনি। ফেরার পথে যখন সব হাল ছেড়ে দিয়েছি তখন এল সুযোগ। তা-ও আশার থেকে বহু গুণ। চিরাচরিত সাংবাদিক সম্মেলন নয়, একদম একক প্রদর্শনী। মহম্মদ আলি ও আমি মুখোমুখি। মুখোমুখি নয়, পাশাপাশি বলাই ভালো। পৃথিবীর ক্ষিপ্রতম মানুষটির সব কিছু তখন ঘটে স্লো মোশানে। ছ-বছরে পার্কিনসন্সের শিকড় মস্তিষ্কে ছড়িয়েছে কিছুটা। আমরা একসঙ্গে ছিলাম ছাব্বিশ মিনিট। সব কৃতিত্বই মহমেডান ক্লাবের তৎকালীন কর্তা মীর মহম্মদ ওমরের। মহম্মদ আলিকে ভারতে নানান ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করেছিলেন ওমর। আমার এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থাও শেষ পর্যন্ত তিনিই করেন। শর্ত ছিল বিতর্কিত প্রশ্ন করা যাবে না, খেলার বাইরের একটিও কথা নয়। কড়া পাহারাদারও ছিলেন পাশে। তখন আমি তরুণ সাংবাদিক, কথা দিলে কথা রাখার দায় আমার নেই। কপি কীভাবে ভালো হয়, সাক্ষাৎকার কীভাবে ভালো হয় সে-দিকেই মন ছিল। খেলা নিয়ে প্রশ্ন ছিল কিছু, খেলার বাইরের কথাই ছিল বেশি এবং তার বেশ কিছু প্রসঙ্গ বেশ বিপজ্জনক। মহম্মদ আলি অমলিন হাসিমুখে উত্তর দিয়েছেন সেসবের। একটাও এড়িয়ে যাননি। অসুখ তাঁকে অনেকটাই কাবু করে ফেললেও ততটা পারেনি, যাতে স্বভাব বদলে যায়। আলির অসুখে একটাই মাত্র সুবিধা আমার হয়েছিল (তবু এমন অসুখ যেন না হয় কারও, বিশেষত আইডলের)— অসুখ মহম্মদ আলির সবপ্রকার গতি এত কমিয়ে দিয়েছিল যে, তাঁর প্রতিটা উচ্চারণ ছিল স্পষ্ট। একবারে না পারলে দ্বিতীয় বার তিনি বলেছেন। অনভ্যস্ত উচ্চারণের দ্বিধাদ্বন্দ্ব আমাকে বিব্রত করেনি। তিন দিনে সব মিলিয়ে পাওয়া গেছিল ছাপ্পান্ন মিনিট। তার মধ্যে একান্তে বিমানবন্দরের সময়টুকু। কখনো সোফায় গা এলিয়ে, কখনো তাঁর বিশাল থাবার মধ্যে আমার হাত হারিয়ে। সলমন রুশদির 'স্যাটানিক ভার্সেস' নিয়ে তখন গোটা দুনিয়া তোলপাড়। 'ইজ জেসাস রিয়েলি গড'— এ-জাতীয় বই প্রচার করছিলেন আলি তখন। শূন্যে ওড়ার কলাও নাকি তিনি দেখাচ্ছেন বিশেষ বিশেষ আসরে। এইসব নিয়েই কথা হয়েছিল। এমনভাবে হয়েছিল যে, কে বলবে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে এই ভদ্রলোক এখনও পৃথিবীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় পুরুষ হতে পারতেন। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে সবকিছু ঘটে গিয়েছিল। কলকাতার এক বাংলা সংবাদপত্রের তরুণ সাংবাদিকের কল্পনায় ছিল না নিউজপ্রিন্ট ভেদ করে তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে গায়ে ঠেস দিয়ে বসে থাকবেন স্বপ্নের মানুষ। তার প্রায় ছাব্বিশ বছর পর খবর এল মৃত্যুর। কী অবাক কাণ্ড! তারিখ ৩ জুন, তখন আমি পায়েস খাচ্ছি, আমার সামনে জ্বলছে প্রদীপ, পাশে বাজছে শঙ্খ— আজ ৩ জুন, ২০ জ্যৈষ্ঠ— আমার জন্মদিন। কাকতালীয় ঘটনা, তবে মহম্মদ আলি যে এভাবে সারাজীবনের জন্য আমার জীবনে ঢুকে পড়বেন কে জানত? আমার কাছে এ তাঁর অজস্র ম্যাজিকের একটা। লোকে বলবে ওই দিনে পৃথিবীর কত লোক জন্মায়, কত লোক মারা যায়— জোর করে যোগসূত্র টানার কী দরকার। ওসব অলস কল্পনা। ঠিকই, কিন্তু তারা তো মহম্মদ আলির গা ঘেঁষে ছাব্বিশ মিনিট বসেনি। আমি জোর করে যোগসূত্র টানার চেষ্টা করি, জোর করেই আঁকড়ে থাকব মহম্মদ আলির স্মৃতি। আর আমার অজান্তে আমার বাকি জন্মদিনগুলোয় আমার পায়েসের বাটি, আমার প্রদীপের সামনে শাঁখের আওয়াজের মধ্যে ঘুয়ে বেড়াবেন মহম্মদ আলি।

মহম্মদ আলি (১৯৪২—২০১৬)

জন্ম: ২৭ জানুয়ারি ১৯৪২। তখন নাম ছিল ক্যাসিয়াস ক্লে জুনিয়র।

১৯৫৪: লুইসভিলের পুলিশ অফিসার ও বক্সিং কোচ জো মার্টিনের নজরে পড়েন নিজের সাইকেল চুরির অভিযোগ করতে গিয়ে। মার্টিন বারো বছরের বালকের মধ্যে হবু বক্সারের সম্ভাবনা দেখতে পান।

১৯৬০: স্টোনারের অভিভাবকত্বে ছ-বার কেনটাকি গোল্ডেন গ্লাভস জয় ও দু-বার ন্যাশনাল গোল্ডেন গ্লাভস খেতাব পাওয়ার পর ষাটের রোম অলিম্পিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বক্সিং দলে নির্বাচিত হন। পোল্যান্ডের জিখনিউ পিয়েত্রিকোস্কিকে ৫-০ ফলে হারিয়ে স্বর্ণপদক পান। অপেশাদার বক্সিং জীবনে তিনি একশোটি লড়াই জেতেন, হারেন পাঁচটি। এই বছরের ২৯ অক্টোবর তিনি পেশাদার বক্সার হন।

১৯৬৪: সনি লিস্টনকে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ধর্ম পরিবর্তন করে ক্যাসিয়াস ক্লে থেকে মহম্মদ আলি হন। নেশন অব ইসলামের সংস্পর্শে এসে তাঁর মন সম্পূর্ণ বদলে যায়। পরে ১৯৭৫ সালে তিনি সুন্নি হন। ক্যাসিয়াস ক্লে— এই নামের মধ্যে তিনি নিগ্রো ক্রীতদাসের গন্ধ পাওয়ায় ওই নাম আর কখনো ব্যবহার করেননি। এই বছর তাঁর প্রথম বিয়ে। পানশালার ওয়েট্রেস সোনজি রোইয়ের সঙ্গে বিয়েটা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৬৬-তে বিচ্ছেদ হয়।

১৯৬৭: তখন ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলছে। আলিকে যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯৬৪ সালে তাঁকে সেনাবাহিনী বাতিল করেছিল লেখা ও বলার ক্ষমতা নিম্নমানের হওয়ায়। কিন্তু ১৯৬৬-তে আবার পরীক্ষা হয় এবং আলিকে যোগ্য ঘোষণা করা হয়। কিন্তু আলি ছিলেন যুদ্ধবিরোধী। তিনি যুদ্ধের বিরোধিতা করেন, তা পবিত্র কোরআনের পরিপন্থী বলে। নিরপরাধ মানুষ-খুনের ভাগীদার হতে রাজি হননি তিনি। এ নিয়ে গোটা বিশ্ব তোলপাড় হয়। খেতাব কেড়ে নিয়ে আলিকে সাসপেন্ড করা হয়। কিন্তু আলির জনপ্রিয়তা বেড়েই চলে।

১৯৬৭: ১৭ অগাস্ট পঁচিশ বছর বয়সে দ্বিতীয় বিয়ে। এবার সপ্তদশী বেলিন্দা বয়েডকে। বেলিন্দাও ধর্মান্তরিত হন। তাঁর নাম খালিলাহ্ আলি। তাঁদের চারটি সন্তান হয়। ১৯৭৭ সালে বিবাহবিচ্ছেদ।

১৯৭০: নির্বাসনের শেষ পর্বে আলি বক্সিং রিংয়ে ফেরার সুযোগ পান। যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র জর্জিয়া প্রদেশে বক্সিং কমিশন ছিল না। সেখানের সেনেটারের জন্য লড়ার সুযোগ এবং প্রত্যাবর্তনের মাত্র তিন রাউন্ডে হারান জেরি কোয়ায়িকে। তার কিছুদিন পর নিউইয়র্ক স্টেট সুপ্রিম কোর্ট জানায়— আলির বক্সিং লাইসেন্স বাতিল ও খেতাব কাড়া অন্যায় ছিল। ফলে সুযোগ আসে নিউইয়র্কে লড়ার। অস্কার বোনাভেনাকে ডিসেম্বরে হারান ১৪ রাইন্ডের লড়াইয়ে, যা সুযোগ করে দেয় জো ফ্রেজিয়ারের বিরুদ্ধে বিশ্বখেতাবি লড়াইয়ে নামার।

১৯৭১: ৮ মার্চ হয় ফ্রেজিয়ারের বিরুদ্ধে অবিস্মরণীয় লড়াই। যাকে 'শতাব্দীর সেরা লড়াই' বলা হয়। দুজনে পান ২.৫ মিলিয়ন ডলার করে। তখনকার রেকর্ড। সেবার আলি হেরে যান পয়েন্টে।

১৯৭৪: আগের বছর কেন নর্টনের বিরুদ্ধে চোয়াল ভেঙে যাওয়ায় হারতে হয় বারো রাউন্ডের ম্যাচে। কিছু মাস পর নর্টনকে হারিয়ে জো ফ্রেজিয়ারের মুখোমুখি হন। এবার প্রাইজ মানি প্রত্যেকের পাঁচ মিলিয়ন ডলার করে। ২৮ জানুয়ারি প্রতিশোধ নেন আলি বারো রাউন্ডের লড়াই জিতে। এই বছরই অক্টোবরে আলি মুখোমুখি হন জর্জ ফোরম্যানের। শতাব্দীর সেরা লড়াইগুলোর অন্যতম সেরা। জাইরয়ের রাজধানী কিনসাসায় অপ্রত্যাশিতভাবে আলি তরুণতর ফোরম্যানকে নক আউট করেন।

১৯৭৫: অক্টোবরে ম্যানিলায় তৃতীয় বার আলি-ফ্রেজিয়ার লড়াই। 'থ্রিলা ইন ম্যানিলা' নামে অভিহিত লড়াইয়ে জেতেন আলি। এই ম্যাচের তীব্র আক্রমণে দুই বক্সারের শরীরে স্থায়ী ক্ষতি হয়।

১৯৭৭: তৃতীয় বিবাহ। এবার ভেরোনিকা পোর্সের সঙ্গে। ইনিই আলির বক্সার-কন্যা লায়লার মা। ফোরম্যানের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় ভেরোনিকা ছিলেন রিংয়ের 'প্রোমেশনাল গার্ল'। এই বিয়েও চিরস্থায়ী নয়। ১৯৮৬ সালে বিচ্ছেদ। দুটি মেয়ে হয়েছিল এই বিয়েতে।

১৯৭৮: লিওন স্পিঙ্কসের কাছে খেতাব হারানোর পর বছরের শেষে তাঁকে হারিয়ে খেতাব ফিরে পাওয়া। ১৫ ফেব্রুয়ারি হারা, ১৫ সেপ্টেম্বর জেতা।

১৯৭৯: মহম্মদ আলি অবসর ঘোষণা করেন।

১৯৮০: অক্টোবরে অর্থের প্রয়োজনে রিংয়ে ফিরে আসেন অবসর ভেঙে। চতুর্থ বারের অভূতপূর্ব বিশ্বখেতাব জয়ের চেষ্টা অবশ্য সফল হয়নি। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর হারেন প্র্যাকটিস পার্টনার ল্যারি হোমসের কাছে।

১৯৮১: সবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে উনচল্লিশ বছর বয়সে আলি শেষ চেষ্টা করেন ফেরার। তরুণ ট্রেভর বারবিকের কাছে হারেন বিচারকদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সিদ্ধান্তে। ওই লড়াইয়ে আলির জেতার কথা। জিতলে খেতাবি লড়াইয়ে সুযোগ পেতেন মাইক উইভারের বিরুদ্ধে। পেতেন হোমসকে হারানোর সুযোগ। ভুল সিদ্ধান্তে যা হয়নি।

১৯৮৪: ধরা পড়ে পার্কিনসন্স সিনড্রোম, যার চিকিৎসা নেই। রিংয়ে বহু বছরের ভয়াবহ ঘুসিগুলো মস্তিষ্কে স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল। তবে অসুখে আলির ক্যারিশমা থামেনি। সামাজিক নানান কাজে দিনে দিনে তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়ে।

১৯৮৬: চতুর্থ বিয়ে। এবার কনে ইয়োলান্ডা উইলিয়ম। আমৃত্যু ইনিই সঙ্গে ছিলেন।

১৯৯৬: আটলান্টা অলিম্পিকে মশাল জ্বালেন আলি।

২০০৫: প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'প্রেসিডেন্সিয়াল সিটিজেন' পদকে সম্মানিত করেন সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রীড়াবিদকে। এই বছরের ৯ নভেম্বর হোয়াইট হাউসে পান 'প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম'। রাষ্ট্রপুঞ্জ দেয় 'ওস্তো হান পিস মেডেল'। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও শান্তির দূত হিসেবে ১৭ ডিসেম্বর দেওয়া হয় এই বিশেষ সম্মান।

২০১৬: ৩ জুন, চুয়াত্তর বছর বয়সে মৃত্যু। ■

গত তিরিশ বছরে আল-আমীন মিশন সমাজকে উপহার দিয়েছে বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রী। পড়াশোনায় সাফল্যের পর তাঁরা দেশে-বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ পেশায় অথবা গবেষণায় ব্যস্ত। সেইসব প্রাক্তনীদের উপস্থিতি এই বিভাগে। এই সংখ্যায় অধ্যাপক

মহম্মদ সোহেল রানা

জীবনে কিছু করতে হলে নিজেকে ফাঁকি দিয়ো না

আসাদুল ইসলাম

এভাবেও ফিরে আসা যায়!

মাইকেল ফেল্পসের মতো নয়। তিনি অসাধারণ প্রতিভাধর, কিংবদন্তি। তাই অবসরের ঘোষণা প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর লড়াইয়ের ময়দানে ফিরে এসে আবার সোনা জেতেন।

রিংয়ের বাইরে একবার চলে গেলে ফিরে এসে আবার সাফল্য অর্জনের জন্য কতটা ঘাম ঝরাতে হয় সেটা 'সুলতান' সিনেমার সুলতান খানই জানেন, যাঁদের তেমন প্রতিভা নেই— ঘষেমেজে পরিশ্রমকে হাতিয়ার করে এগিয়ে যান। সুলতান খানের মতো এমনই এক প্রাক্তনীর কথা আপনাদের জানাব। যিনি কোনো আহামরি ফল করতে পারেননি বলে বিজ্ঞান টানতে পারেননি। আল-আমীন মিশন ছেড়ে ভর্তি হয়েছিলেন গ্রামের সাধারণ স্কুলে। যে-আশা নিয়ে উচ্চ-মাধ্যমিকে দিনরাত পরিশ্রম করে পড়াশোনা করেছিলেন, সে-ই আশাও পূরণ হয়নি। স্নাতক স্তরে পছন্দের বিষয় পাননি। বিকল্প হিসেবে যে-বিষয়ে অনার্স পড়বেন ঠিক করেছিলেন, সেই তালিকাতেও তাঁর নাম ছিল ৯১-তম স্থানে। আর সিট ছিল মাত্র পঁচিশটি! এর পরের পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়। অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে-বিষয়কে তিনি তৃতীয় পছন্দ হিসেবে রেখেছিলেন, সেটাকেই প্রথম পছন্দ হিসেবে নিতে হয়। সেই ছাত্রই আজ অধ্যাপনা করছেন। তাঁর সহপাঠীরা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আল-আমীন মিশনের, নিজেদের বাবা-মায়ের, সমাজের মুখ উজ্জ্বল করবে, আর সেই ছাত্র কোন মুখ নিয়ে দাঁড়াবেন বন্ধু-বান্ধবের সামনে— মিশন ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তে ছাত্রটির মনে হয়েছিল এমন কথা। প্রায় হাজার খানেক ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের মাঝে তিনিই

কোনো প্রতিজ্ঞা করা যত সহজ, তা রক্ষা করা বহু গুণ বেশি কঠিন। সোহেল এই কঠিন কাজটাই করতে শুরু করলেন। এই কাজে তিনি তাঁর মা-আব্বাকে পাশে পেলেন। পাশে পেলেন বলাটা ঠিক হল না, লড়াইয়ে সামিল হলেন।

আল-আমীন মিশনের প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনকারী। মাইকেল ফেল্পস, সুলতান খানরা ভিনগ্রহের প্রাণী, তাঁদের কথা বাদ দিয়ে মাটি ছোঁয়া আমাদের পাড়া-গাঁয়ের এই ছেলেটির কথা, আসুন, জেনে নিই।

আল-আমীন মিশনে ভর্তি হওয়া বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা প্রত্যাশা করেন, তাঁদের ছেলে-মেয়েরা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবে, ডব্লিউবিসিএস অফিসার হবে, কলেজে-স্কুলে পড়াবে। আল-আমীন মিশন তাঁদের এই প্রত্যাশাকে অনেকাংশে পূরণ করতে পেরেছে বলেই রাজ্য জুড়ে মিশন সম্ভ্রম অর্জন করতে পেরেছে। আল-আমীন মিশনে ভর্তির ক্ষেত্রে উত্তুঙ্গ চাহিদা তৈরি হয়েছে এ-কারণেই। আল-আমীন মিশনে ভর্তি হওয়া মানে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বা শিক্ষক হয়ে যাওয়া, তা কিন্তু নয়। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কোনো ব্যবস্থাপনা তৈরি হয়নি— সেটা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, প্রশাসন যাই-ই হোক-না-কেন— যেখানে একশো শতাংশ সাফল্য সব সময় অর্জন করা যায়। আল-আমীন মিশনও এই নিয়মের বাইরে নয়। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, পারিবারিক সমস্যা বা ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের নানা সমস্যার কারণে কিছু ছাত্র-ছাত্রী আশানুরূপ ফল করতে পারে না। সবাই ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চান্স পায় না, সবাই ৮০ শতাংশের বেশি নম্বর পায় না। এইসব না-পাওয়া মানে এই নয় যে, জীবন শেষ হয়ে গেল। যাঁরা মন-খারাপ করে মিশনের মাঠ ছেড়ে যায়, এবারের উজ্জ্বল প্রাক্তনীর লেখাটা সেইসব ছাত্র-ছাত্রীর জন্য। এই সংখ্যার উজ্জ্বল প্রাক্তনীর জীবন থেকে তোমরা যদি একটা শিক্ষা নিতে পারো, তাহলে দেখবে, তোমরাও হারতে হারতে একদিন জিতে যাবে। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সহপাঠীদের পাশে তোমরাও দাঁড়াতে পাড়বে। এবং চাইলে তোমার মাথাকে তুমি অনেক ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের চেয়েও বেশ খানিকটা উঁচুতে তুলে ধরতে পারবে।

সোহেল রানার জীবন থেকে তোমরা যদি একটা শিক্ষা নিতে পারো, তাহলে দেখবে, তোমরাও হারতে হারতে একদিন জিতে যাবে। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সহপাঠীদের পাশে তোমরাও দাঁড়াতে পাড়বে। এবং চাইলে তোমার মাথাকে তুমি অনেক ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের চেয়েও বেশ খানিকটা উঁচুতে তুলে ধরতে পারবে।

ভূমিকা শেষ করে মূল গল্পে ফেরা যাক। আল-আমীন মিশনের প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রিধারীর নামটা প্রথমে জানাই আপনাদের— মহম্মদ সোহেল রানা। বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল থানার শিবনগর গ্রামে। রাজ্যের অন্যান্য জেলাতে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হলেও মুর্শিদাবাদে সংখ্যাগুরু। ডোমকল থানা এলাকায় মুসলমান জনসংখ্যার হার প্রায় ৬৫ শতাংশ। শিবনগর গ্রামটা পুরোটাই মুসলমান অধ্যুষিত। শিবনগর গ্রামের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের অন্যান্য গ্রামের একটু ফারাক আছে। শিবনগর গ্রামে শিক্ষার হার অন্যান্য গ্রামের তুলনায় অনেক বেশি। গ্রামে কোনো মাটির বাড়ি নেই। গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা চাষবাস হলেও চাকরিজীবী মানুষের হারও অন্যান্য গ্রামের তুলনায় বেশি। ছোটোখাটো ব্যাবসার সঙ্গেও জড়িত আছেন কেউ কেউ।

সোহেলদের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা বেশ ভালো। গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো পাকা বাড়ি তাদের। দাদাজি হাজি সাহেব। বড়োচাচা শিক্ষকতা করতেন, অন্য এক চাচা রেশন ডিলার। আর সোহেলের আব্বা মহম্মদ জহুরুল হক ব্যাবসা করেন। তাঁর পড়াশোনা বিকম তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত। মা সেলিনা বিবি মাধ্যমিক পাশ। মা-বাবার তিন সন্তানের মধ্যে সোহেল বড়ো। আর-এক ভাই জুয়েল ওয়াসিফ ইংরেজিতে এমএ করেছেন। পঞ্চায়েতে চাকরি করেন। বোন শিফা খাতুন এমএ, বিএড। একটি বিএড কলেজে পড়ান। এটুকু পড়ে সোহেলের পরিবার সম্পর্কে খানিকটা আঁচ করা সহজ হল হয়তো। জীবনে সাফল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় আর্থিক প্রতিকূলতা না থাকলেও অন্য অনেক ভাগ্য-বিড়ম্বনার বিরুদ্ধেও লড়তে হয়। আসল কথা লড়াই করা। প্রতিপক্ষ হতে পারে নিজের শারীরিক-মানসিক সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা বা অন্য কোনো সামাজিক সমস্যা। সমস্যার মোকাবিলা করেই হাজির হওয়া যায় সাফল্যের ময়দানে। এই কারণেই হয়তো কবীর সুমন বলেছিলেন— হাল ছেড়ো না। হাল না ছাড়লে দেখা হবে অন্যকোনো ভোরে। আসবে নতুন দিন। যেমন সোহেল আজ পেয়েছেন নতুন জীবন।

সোহেলের নতুন জীবনে পৌঁছোনোর গল্পে আবার ফেরা যাক। সোহেলের জীবনের প্রথম স্কুল ছিল ঝাঝাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। যে-বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করতে হত আম গাছের ছায়ায়, ছেঁড়া বস্তা বিছিয়ে। দু-কামরার পাকা ঘরের ক্লাসে ঢোকার যোগ্যতা লাগত কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণি পাস। এক বছর পাকা ঘরে ক্লাস করার সাধ মিটিয়ে সোহেল চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলেন শিবনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্কুলটা একটু ভালো। একই চত্বরে হাই স্কুলও। এক বছর পর ক্লাস ফাইভ থেকে তো যেতেই হত। আরও এক বছর আগে থেকে গেলে ক্ষতি কী!

'উজ্জ্বল প্রাক্তনী' বিভাগে এতদিন যাঁদের নিয়ে লেখা হয়েছে, তাঁদের অনেকেই পড়ুয়া হিসেবে ফলের দিক থেকে অসাধারণ। আগাগোড়া ভালো ফল করেছেন। কয়েক জন সাধারণ। অতি সাধারণ পড়ুয়ার উদাহরণ সোহেল রানা। কীরকম? ক্লাস থ্রিতে পড়ার সময় যে-ছাত্রের অবস্থান হয় চল্লিশ জনের মধ্যে ২৪-তম, তাঁকে অতি সাধারণ পড়ুয়া বলাই যায়। মাধ্যমিক বা উচ্চ-মাধ্যমিকেও তেমন কোনো আহামরি ফল করতে পারেননি।

সোহেলের পড়াশোনার দিকটা এবার বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। গ্রামের স্কুলে ফাইভ শেষ করে সিক্সে ওঠার সময় আল-আমীন মিশনে ভর্তির পরীক্ষায় বসেন। মুর্শিদাবাদ জেলার রানিনগর থানার শেখপাড়ায় বাড়ি মুর্শিদ সারওয়ারের। আল-আমীন মিশনের ছাত্র। সম্পর্কে সোহেলদের আত্মীয়। তিনি মিশনে ভর্তির ফর্ম বিভিন্ন ছাত্রদের দিতেন। সে-বছর একটা ফর্ম বেঁচেছিল। কাকে দেওয়া যায় ভাবতে ভাবতে সেটা পাঠিয়েছিলেন সোহেলের আব্বার কাছে। ভর্তির ফর্ম ভরে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সোহেলের আব্বা মুর্শিদাবাদ থেকে হাওড়ার খলতপুরে এসে পৌঁছোলেন। খলতপুর এসে ভর্তির ব্যাপার যখন অনেকটা এগিয়েছে, তখনই তীরে এসে তরী ডোবার অবস্থা হল। আল-আমীন মিশন সমাজের মানুষের অনুদানে তৈরি এ-কথা সকলেই জানেন। এই অনুদান আসে সমাজের বিত্তশালী মানুষদের থেকে। এঁদের মধ্যে মিশনে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরাও আছেন। দরিদ্র-মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা, থাকা-খাওয়ার খরচ জোগাড়ের লক্ষে বিত্তবান অভিভাবকদের কাছে আবেদন করা হয়, তাঁদের ছেলে-মেয়ের খরচ ছাড়াও বাড়তি কিছু অর্থ দান করতে। এরকমই আবেদন রাখা হয়েছিল সোহেলের আব্বার কাছে। তিনি তাতে অসম্মত হয়ে সোহেলকে ভর্তি না করে বাড়ি ফেরত নিয়ে চলে যান। পরে মিশন বিনা অনুদানে ভর্তির খবর পাঠালে তিনি সোহেলকে মিশনে রেখে যান। শুরু হয় সোহেলের মিশন-জীবন।

১৯৯৪ সালে আল-আমীন মিশন মানে খলতপুর। আল-আমীন মিশন মানে একটা মাত্র বিল্ডিং। তাও দু-তলা। মাদ্রাসা বিল্ডিংয়ের দু-তলার

রুমগুলোয় ছাত্রদের থাকা পড়াশোনা। খাওয়া-দাওয়া হত বারান্দায়। নমাজ ছাদে। মিশনে এসে নমাজ পড়া শুরু হল সোহেলের জীবনে। জীবনের প্রথম ওয়াক্তিয়া নমাজ পড়েছিলেন হাফপ্যান্ট পরে। হাসেম স্যারের তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল নমাজের কাতারে। অন্যদের আড়চোখে দেখে অনুশীলন করে করে রপ্ত হয়েছিল নমাজের প্রথম পাঠ। সে-সময় মিশনে ছাত্র ছিল তিনশোর আশেপাশে। সোহেলদের ব্যাচে, ফাইভের ছাত্র ছিল তেইশ জন। বারো জন একটা ঘরে থাকত। দুজনের বেডে তিন জনকে থাকতে হত। সোহেলদের মতো ফুল-পেয়ি আর নন-পেয়ি— সবার জন্য একই ব্যবস্থা। আলু ভর্তায় যে-দিন লেবু পড়ত সে-দিন ভাত কম পড়ে যেত। আলু ভর্তা ভালো করার আর-একটা ফন্দি ছিল সোহেলদের। রান্না করতেন যিনি, সেই নানাজিকে রাগিয়ে দেওয়া। নানার সেই রাগ গিয়ে পড়ত বেচারি আলুসেদ্ধর ওপর। ফলে দু-চার ঘা বেশি পড়ত। মোলায়েম আলু ভর্তার স্বাদই যেত বদলে। মিশনের মিঠে-নোনতা জীবনকে আরও স্বাদু করে নিয়েছিলেন সোহেলরা নানা কেরামতি দেখিয়ে। ওঁরা থাকতেন ১৭ নম্বর রুমে। রুমের নাম ছিল RAJA SANKARAN– বারো জন বন্ধুর নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি করা। সেই সময় ১৭ নম্বর রুমের ছাত্ররা আরও একটা জিনিস করেছিলেন— নিজেদের রুমের নামে কুইজ অ্যাসোসিয়েশন। ওই রুমের বারো জন সদস্য পড়াশোনার সঙ্গে আরও কিছু এক্সট্রা বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। এক-এক দিকে একজন পারদর্শী ছিলেন। যেমন সোহেল ছিলেন খেলাধুলায় পারদর্শী। আল-আমীন মিশনে পড়ার সময়ই জেলা স্তরেও অংশ নিয়েছিলেন। ক্রীড়া দলের পাণ্ডা ছিলেন বলা যায়। কোনো ম্যাচ হওয়ার কথা হলে খেলোয়াড় নির্বাচন থেকে সামগ্রিক পরিকল্পনা করতে হত তাঁকে। সোহেল আল-আমীন মিশনের সুখস্মৃতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আরও বেশ কিছু ঘটনার কথা বলেছেন। তার মধ্যে থেকে দুটো বিষয় উল্লেখ করে আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে যাব। একটা, পড়াশোনা সংক্রান্ত, সেই সময় সোহেলদের অঙ্ক শেখাতেন হারাধন স্যার। তাঁর এক নিয়ম ছিল— পরীক্ষায় নম্বর কম পেলে ছাত্রদের ওপর লাঠ্যৌষধী প্রয়োগ করা। ওষুধের ডোজের নিয়মটাতেই ছিল তাঁর ইউনিকনেস। কীরকম? ২৫ নম্বরের পরীক্ষায়, ধরা যাক, কেউ ১৫ পেয়েছেন, তাহলে ওষুধের মাত্রা হবে দশ ডোজ, মানে দশ ঘা ছড়ি। অন্যটা ছাত্রদের রিফ্রেশমেন্ট সংক্রান্ত। বছরে এক-আধবার এই সুযোগ মিলত। তখন আজকের মতো হাতের মুঠোয় বিনোদনের পসরা সাজানো ছিল না। তখনও ঘরে ঘরে টিভি ছিল না। সাধারণ মানুষ হলে গিয়ে সিনেমা দেখতেন, নয়তো ভিসিডি ভাড়া করে সিনেমা দেখার সুযোগ পাওয়া যেত। প্রায় ইটের সাইজে লম্বা আর ইটের তিন ভাগের এক ভাগ পাতলা ক্যাসেট চালিয়ে সিনেমা দেখা হত। বছরে এক-আধবার সেক্রেটারি স্যারের অনুমতি নিয়ে ভিসিডি চালিয়ে সিনেমা দেখে রাতভর প্রায় অমৃত-তুল্য আনন্দের স্বাদ নিত ছাত্ররা। কিন্তু সেটা বাঁধনহারা ছিল না। ছাত্ররা নিজেরা এক টাকা করে চাঁদা তুলে এই আনন্দ-যজ্ঞের আয়োজন করলেও মেনু ঠিক করে দিতেন সেক্রেটারি স্যার। 'জমালয়ে জীবন্ত মানুষ' 'তাহাদের কথা'— এমন সব সিনেমা তিনি নির্বাচন করে দিতেন। এইসব ঘটনার কথা শুনে আন্দাজ করা যায় মিশন পরিবার তখন ছিল 'ছোটো পরিবার সুখী পরিবার' স্লোগানের আদর্শ প্রতিরূপ।

মিশনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে মহম্মদ সোহেল রানা।

সুখ-দুঃখের এইসব ঘটনা নিয়ে পড়াশোনা চালাচ্ছিলেন সোহেল। মিশনে এসে যে সোহেল খুব ভালো ফল করে ফেললেন, সেটা কিন্তু হল না। মিশনে পরীক্ষার ফল ঘোষণার সময় দশ-বারো জনের পর নাম ডাকা হত সোহেলের। তিনি আশা করেছিলেন মাধ্যমিকে স্টার মার্কস অন্তত পাবেন। এ-ব্যাপারে তিনি এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে, ফল প্রকাশের আগেই সকলকে মিষ্টি খাওয়াবেন বলে মিষ্টি কিনতে চলে গিয়েছিলেন। সেটা অবশ্য বাড়িতে। মাধ্যমিকের ফল ঘোষণার আগে কিছুদিন ছুটি থাকে, সেই ছুটিতে বাড়িতেই ছিলেন। বাড়ি থেকে দু-কিমি দূরে টেলিফোন বুথ থেকে মিশনে ফোন করছেন ফল জানার জন্য, হাতে দু-প্যাকেট মিষ্টি ধরা আছে। জানলেন, স্টার তো দূরের কথা, ৭০ শতাংশ নম্বরও পাননি। পেয়েছেন ৬৮ শতাংশ নম্বর। নদীর বাঁধ ধরে বাড়ি ফেরার পথ। সেই পথের ধারে মন-খারাপ করে বসে আছেন। হাতে সেই দু-প্যাকেট মিষ্টি, মিষ্টিগুলো কী করবেন— ফেলে দেবেন, না কাউকে দিয়ে দেবেন, ভাবছেন। এমন সময় পাড়ার এক গরিব বাড়ির মেয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, তিনি শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন। তাঁর হাতে প্যাকেটদুটো তুলে দিলেন। মাধ্যমিকে খারাপ ফল হওয়া দিয়ে বিপর্যয়ের শুরু সোহেলের জীবনে। দ্বিতীয় ধাক্কাটা এল মিশনে এসে। কিছু দিন ক্লাস করার পর দেখলেন, পড়াশোনায় সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারছেন না। সমাধান খোঁজার চেষ্টায় সেক্রেটারি স্যারের কাছে গেলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, সায়েন্স টানতে না পারলে আর্টস নিয়ে পড়াশোনা করার। আর্টস নিয়ে পড়লে বাড়ি থেকেই পড়বেন সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রায় ছ-বছর মিশনে কাটিয়ে যে-দিন মিশন ছেড়ে দিলেন, নিজের জিনিসপত্র নিয়ে ফেরার পথে দু-ফোঁটা চোখের জল পড়েছিল সবার অলক্ষে। কিছু একটা করার জেদ তৈরি হয় তখনই। সেই সময়কার হতাশার মাঝে আশার আলো দেখিয়েছিলেন তাঁর আব্বা। মিশনের চেনা পরিবেশ, পরিচিত বন্ধু-বান্ধব আর নানা স্মৃতিকে পিছনে ফেলে আসতে হচ্ছিল বলে বুকটা অসম্ভব ভারী হয়েছিল। বাসে করে যখন ফিরে আসছেন, বাসের জানালা দিয়ে ফেলে আসা অতীতকে দেখতে দেখতে ফিরছেন বাড়ি। পাশের সিটে আব্বা বসে আছেন। বিশেষ কোনো কথা বলছেন না দেখে, তাঁর আব্বা বললেন, 'বেকার মন-খারাপ করে কোনো লাভ নেই। তোমার কপালে যা আছে, তাই হবে— সেটা মিশনে থেকে পড়ো আর বাইরে থেকে পড়ো।' এই সান্ত্বনাই সম্বল হয়ে উঠল সোহেলের।

বাড়ি ফিরে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর ঠিক হল এগ্রিকালচারকে মেন সাবজেক্ট হিসেবে নিয়ে পড়াশোনা করার। পরামর্শ দিয়েছিল সোহেলের আব্বার পরিচিত সাদি খান দিয়ার বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক বাজিত হোসেন। তাঁর যুক্তি ছিল— উচ্চ-মাধ্যমিক করার পর এগ্রিকালচার নিয়ে বিএসসি, তারপর এমএসসি এবং পিএইচডি করলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। দুটো চাচাতো ভাই এগ্রিকালচার নিয়ে পড়ছিলেন। তাঁদের বইপত্র-সিলেবাস দেখে বিজ্ঞান না পড়তে পারার আফশোস মেটানো যাবে বলে মনে হওয়ায় এগ্রিকালচার নিয়েই ভর্তি হয়ে গেলেন। এর জন্য ভর্তি হতে হল বাড়ি থেকে পঁচিশ কিমি দূরের স্কুলে। সোহেলদের বাড়ি থেকে ডোমকল বাজারের দূরত্ব দশ কিমি। ওই বাজারেই সোহেলের আব্বার দোকান। ডোমকল থেকে আরও পনেরো কিমি বাসে যেতে হবে স্কুল যাওয়ার জন্য। বাড়ি থেকে প্রথম স্কুল যাওয়ার

দিনটা আজও ছবির মতো ভাসে সোহেলের সামনে। সিট পেয়ে বসেছিলেন। আর সারাক্ষণ মিশনের কথা মনে পড়ছিল। এতটাই মন-খারাপ হয়েছিল, সে-দিন বাড়ি ফিরে সেক্রেটারি স্যারকে তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন। লিখেছিলেন তাঁর সহপাঠী 'রোহণ-নওরোজরা ইঞ্জিনিয়ার-ডাক্তার হবে, আর সোহেল কী হবে? যদি কিছু না হতে পারি তাহলে কী করে মুখ দেখাব, কীভাবে মিশনে যাব? আমি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, এখানে থেকেই কিছু করে দেখাব।' বলা বাহুল্য, কোনো প্রতিজ্ঞা করা যত সহজ, তা রক্ষা করা বহু গুণ বেশি কঠিন। সোহেল এই কঠিন কাজটাই করতে শুরু করলেন। এই কাজে তিনি তাঁর মা-আব্বাকে পাশে পেলেন। পাশে পেলেন বলাটা ঠিক হল না, লড়াইয়ে সামিল হলেন। এই লড়াইয়ে তাঁদেরও যে-ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, সেটা খুব কম বাবা-মা-ই ভাবতে পারেন। কয়েক দিন স্কুল যাতায়াত করার পর কষ্ট দেখে ঠিক হল সোহেল তাঁদের ডোমকল বাজারের দোকানে থেকেই পড়াশোনা করবেন। তাও বিশেষ সুবিধার হল না। খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-জামা ধোয়ার ঝামেলা তো কম নয়। দু-একজন পরামর্শ দিলেন, ছেলেকে মানুষ করতে হলে তার সঙ্গেই থাকতে হবে। মা-আব্বা গ্রাম ছেড়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। সাড়ে তিন কিলোগ্রাম চাল, দুটো কাঁথা আর ছোটো দুই সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে সোহেলের আব্বা-মা সোহেলের কাছে চলে এলেন। শুরু হল তাঁদের সম্মিলিত লড়াই। গ্রামের বড়ো বাড়ি ছেড়ে এসে যে দু-কামরা বাড়িতে থাকা শুরু করলেন, তার একটা বরাদ্দ হল সোহেলের জন্য। সোহেল আরও একটি নোটিশ টাঙালেন— যখন তিনি পড়াশোনা করবেন, যেন চামচ পড়ার শব্দও কানে না আসে। সোহেলের আব্বা-মাও তাঁর এই আবদার মিটিয়ে ছিলেন ছেলের একাগ্রতা দেখে। কীরকম সে-একাগ্রতা? সোহেলের মুখ থেকেই শোনা যাক, 'আমি আব্বাকে বলেছিলাম, ভোর চারটেয় আমাকে ঘুম থেকে তুলে দেবেন। আব্বাকে চারটেয় বললেও আমি সাড়ে তিনটেয় উঠে পড়তে বসে যেতাম। আব্বা প্রতিদিন তুলতে গিয়ে দেখতেন আমি পড়ছি। না ডেকে শুধু দেখে চলে যেতেন।' সোহেলের আব্বা সোহেলকে বলেছিলেন, যারা বোর্ডে র‍্যাঙ্ক করে, তারা দৈনিক ষোলো ঘণ্টা পড়ে। অনেক চেষ্টা করেও সেই লক্ষ ছুঁতে না পেরে সোহেল বলেছিলেন, বারো ঘণ্টার বেশি পড়া সম্ভব নয়। মুচকি হেসে জহুরুল সাহেব বলেছিলেন, 'তোমাকে বারো ঘণ্টাই পড়তে হবে।' খেলাধুলা, আড্ডা-গল্প বাদ দিয়ে সোহেল দু-বছর এভাবেই পড়েছিলেন। ফল কী হল? ওই স্কুলে এগ্রিকালচার নিয়ে পড়ত বাহাত্তর জন। সোহেল প্রথম হতেন। ২০০১ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পেলেন ৭১ শতাংশ নম্বর। এগ্রিকালচার নিয়ে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গিয়ে দেখলেন অন্য দৃশ্য। তিরিশটা সিটের মধ্যে মাত্র তিনটে সিট এগ্রিকালচার নিয়ে পড়া ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ, বাকি বিজ্ঞান বিভাগের পড়ুয়ারা দখল করে নিয়েছেন। আবার

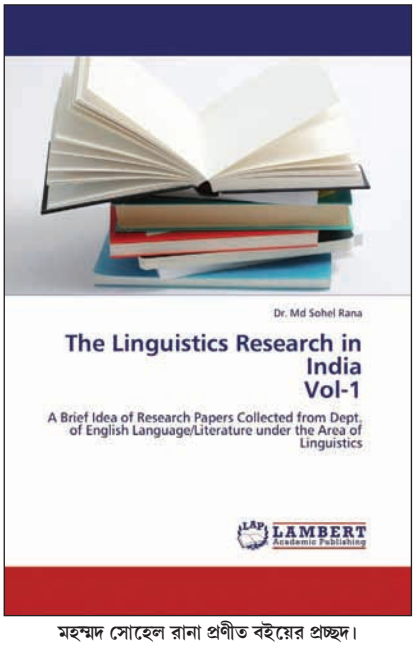

মহম্মদ সোহেল রানা প্রণীত বইয়ের প্রচ্ছদ।

মহম্মদ সোহেল রানার লেখা বই প্রকাশ করছেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক।

ধাক্কা খেলেন। সুযোগ হবে না দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ভাঙা মন নিয়ে ইংরেজি অনার্স পড়ার লক্ষ্যে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ফর্ম ফিল-আপ করলেন। দেখা গেল সোহেলের নাম আছে নব্বই জনের পর। আর আসন সংখ্যা মাত্র পঁচিশটা। কোনো কূল-কিনারা পেলেন না ভেবে। শেষে কাউন্সেলিংয়ের দিন মা-ছেলে বের হলেন কে এন কলেজের উদ্দেশ্যে। আব্বা নিষেধ করলেন। বললেন, গিয়ে কোনো লাভ হবে না। মা বললেন, কাউন্সেলিং কেমন করে হয়, সেটা তো দেখা হবে। শেষে নাম ডাকতে ডাকতে যখন পঁচাশি নম্বর পর্যন্ত নেমেছে, তখন সোহেল আতঙ্কে কাঁপতে শুরু করেছেন। কারণ, সার্টিফিকেট-মার্কসিটটাই তাঁরা নিয়ে যাননি। আশাই করেননি তাঁর সুযোগ হবে। শেষে কর্তৃপক্ষকে সবটা বলে অনুরোধ করে ভর্তির ব্যবস্থা হল।

কলেজের প্রথম বছরটা পুরোপুরি বেকার গিয়েছিল। প্রথম চার মাস শুধু র‍্যাগিং হয়েছিল। থাকতেন কলেজের পাশের কুমার হস্টেলে। এই হস্টেলের আবাসিক কুমারদের কীর্তির শেষ ছিল না। ছাত্রদের হস্টেল হলেও সেখানে পড়াশোনা বাদ দিয়ে আর সবকিছুই হত। গোল্লায় যাওয়ার অবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্য দ্বিতীয় বছরে একটা ঘটনা ঘটল সোহেলের জীবনে, সে-ঘটনাটা তাঁর পুরো জীবনটাকেই অন্য খাতে নিয়ে গিয়ে ফেলল। কলেজেরই এক বন্ধু— নাম কাসেম— আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো ফর্ম তুলেছিলেন। একটা নিজের জন্য। হাতের কাছে সোহেলকে পেয়ে অন্য ফর্মটারও সদ্‌গতি করা গেল। সোহেল ফর্মটা নিয়ে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, কলেজের শিক্ষক আলমগির বিশ্বাসের কাছে গেলেন। উনি পরামর্শ দিলেন ফর্মে পছন্দের বিষয় হিসেবে প্রথমে ইংরেজি, দ্বিতীয় পছন্দ ভূগোল আর তৃতীয় লিঙ্গুয়িস্টিকসকে রাখার জন্য। সিদ্ধান্ত হল তিনটের মধ্যে যেকোনো একটাতে অনার্স পাওয়া গেলে ভর্তি হয়ে যাবেন। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ছিল— ভর্তি হয়ে এক বছর ক্লাস করার পর কেউ অন্য বিভাগে চলে যেতে পারে। এই হিসেবে প্রথমে ইংরেজি হয়ে গেলে ভালো, না হলে ভূগোল, তাও যদি না হয় শেষে লিঙ্গুয়িস্টিকস নিয়ে ভর্তি হয়ে যাবেন। কিছুদিন পর খবর এল ইংরেজি ভূগোল হয়নি, লিঙ্গুয়িস্টিকসকেই সুযোগ পাওয়া গেছে। কে এন কলেজের পাঠ চুকিয়ে দিয়ে সোহেল আলিগড় চলে গেলেন। আবার এক বছর বেকার গেল। আল-আমীন মিশনে ভর্তির সময় যেমন সিক্সের বদলে ফাইভে ভর্তি হয়ে এক বছর নষ্ট হয়েছিল, সেরকমই আরও একটা বছর নষ্ট হল। জীবনে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে সোহেলের দু-বছর নষ্ট হলেও, তা বৃহত্তর সুবিধা দিয়েছিল সোহেলকে। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের অন্যান্য

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম খরচে পড়াশোনা করা যায়। ফলে থাকা-খাওয়া-পড়াশোনার কোনো সমস্যা না থাকলেও অন্য সমস্যা হল দ্বিতীয় বছর। পরিকল্পনা ছিল লিঙ্গুয়িস্টিকস বদল করে ইংরেজি বা ভূগোল নিয়ে পড়ার। লিঙ্গুয়িস্টিকস বা ভাষাতত্ত্ব বিষয়টা ভাষার গঠন ও ব্যাকরণগত দিক নিয়ে। বিদেশে চাহিদা থাকলেও দেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর ছাড়া তেমন বিশেষ সুযোগ নেই চাকরি-বাকরি পাওয়ার। ফলে যারা লিঙ্গুয়িস্টিকস নিয়ে ভর্তি হয়, তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই টার্গেট থাকে পরের বছর অন্য কোনো বিভাগে চলে যাওয়ার। সোহেলদের সময় এমন অবস্থা হল যে, সবাই ছেড়ে চলে যেতে চাওয়ায় লিঙ্গুয়িস্টিকস বিভাগটাই ফাঁকা হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে যা হয়নি, তাই করলেন, নোটিশ জারি করে জানিয়ে দেওয়া হল— বিভাগ বদল করা যাবে না। সোহেলের জীবন আরও একবার ধাক্কা খেল। যদিও পরের বছর থেকে আবার পুরোনো নিয়ম যথারীতি চালু হয়ে গিয়েছিল। ২০০৫ সালে সোহেল ৬৫.০৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে ভাষাতত্ত্বে স্নাতক হলেন। স্নাতক হওয়ার পর আরও একবার ভেবেছিলেন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে পড়ার। সোহেলের আব্বা নিষেধ করলেন। বললেন, যে-বিষয় নিয়ে পড়ছ, সেই বিষয় নিয়েই যতদূর এগোনো যায় এগিয়ে যাও। ফলে ভাষাতত্ত্বেই এমএ করলেন। ২০০৭ সালে ৭২.১৪ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাস করলেন। এরপর দুটো রাস্তা খোলা ছিল— নেট পরীক্ষায় বসা, পিএইচডি করা। বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি সিট ছিল চারটে। চতুর্থ র‍্যাঙ্ক করে সুযোগ হল পিএইচডি করার। ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান এ আর ফাতেহির তত্ত্বাবধানে শুরু করলেন গবেষণার কাজ। গবেষণার দু-বছরের মধ্যে প্রথম বছর কোনো কথাই বলেননি তিনি। শুধু বলেছিলেন, 'মেটিরিয়াল জোগাড় করো আর পড়াশোনা করো।' রিসার্চ বিষয়টা জানতেনই না। ফলে এ এম ইউ-র যে বিশাল লাইব্রেরি আছে, সেখানে গিয়ে ভাষাতত্ত্ব-সহ সব রকমের রিসার্চ ওয়ার্ক দেখে আর বইপত্র জোগাড় করে পড়তে লাগলেন। এই সময় প্রতিদিন গাইড আর গবেষকের নিয়ম করে দেখা হলেও কোনো কথা হত না। ফাতেহি সাহেব ডিপার্টমেন্টের গেট খুলতেন ঠিক সকাল ন-টায়, তার ঠিক এক মিনিট আগে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন সোহেল। এভাবে পুরো এক বছর চলার পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী পড়েছ লিস্ট দাও।' লিস্ট দেওয়ার পর উনি প্রতিটি বই ধরে ধরে জানতে চাইলেন, বইগুলোতে কী আছে। সোহেলের থেকে সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে বুঝে গেলেন কতটা পড়াশোনা করেছেন তাঁর ছাত্র। এরপর উনি রিসার্চ পেপার তৈরি করার নির্দেশ দিলেন। সোহেলের গবেষণার বিষয় ছিল— 'কনভার্সোনাল ক্লজ অ্যাজ এ মেজর অব ওর‍্যাল অ্যাবিলিটি'। দ্বিতীয় বছরের গবেষণাকালে কর্ণাটকের মহীশূরের সেন্ট্রাল ইনসটিটিউট অব ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে একটা ফেলোশিপ পেয়েছিলেন। সারা ভারত থেকে তিপ্পান্ন জন আবেদন করেছিলেন, এগারো জন নির্বাচিত হন। তার মধ্যে সোহেলও ছিলেন। ওই প্রতিষ্ঠানে বাইশটা ভাষায় গবেষণা হয়। ভারতের সবচেয়ে বড়ো ল্যাঙ্গুয়েজ রিসার্চ সেন্টার। দশ হাজার টাকার ফেলোশিপ পাওয়ার পাশাপাশি প্রচুর উন্নত মানের গবেষণাপত্র দেখারও সুযোগ পেয়েছিলেন ওই প্রতিষ্ঠান থেকে। গবেষণা তখনও শেষ হয়নি, বেশ খানিকটা বাকি। হঠাৎ ড. ফাতেহি সোহেলকে ফোন করে ডাকলেন। উনি একটা ফোন নম্বর দিয়ে দিল্লি যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সৌদি আরবের জাজান ইউনিভার্সিটি ইনস্ট্রাকটর পদে লোক নেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পদাধিকারীরা এসেছেন। দেখা করে ইন্টারভিউ দেওয়ার কথা বললেন। সোহেল ইন্টারভিউ দিয়ে নির্বাচিত হলেন। ফিরে এসে ড. ফাতেহিকে জানাতে তিনি বললেন, 'জব করবে, না পিএইচডি?' পিএইচডি বলার পর বললেন, 'বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলো।' ওই চাকরিতে মাসিক বেতন ছিল আশি হাজার টাকা। সোহেলের আব্বাও ওই আর্থিক প্রাপ্তিকে দূরে ঠেলে সোহেলকে পিএইচডি শেষ করার পরামর্শ দিলেন। জাজান ইউনিভার্সিটিকে সোহেল জানালেন ছ-মাস পরে জয়েন করবেন, পিএইচডি শেষ করে। ওঁরা সম্মত হলেন। ড. ফাতেহি তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করা প্রথম ছাত্র, বর্তমানে আমেরিকার মিচিগান ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক, সৈয়দ এক্তিয়ার আলিকে সাহায্য করার জন্য বললেন, যাতে সোহেল তাড়াতাড়ি রিসার্চ পেপার জমা দিতে পারেন। ওই সময় চার মাসের জন্য ছুটি নিয়ে এক্তিয়ার আলি ভারতে এসেছিলেন। এক্তিয়ার আলি তাঁর স্যারের নির্দেশ ফেলতে পারলেন না। সোহেল বিশেষ সহায়তা পেয়ে দ্রুত পেপার তৈরি করলেন। ২০১০ সালে পিএইচডি সম্পূর্ণ হল। আল-আমীন মিশনের প্রথম ডক্টরেট হওয়ার গৌরব অর্জন করলেন সোহেল। ডিগ্রি পাওয়ার দিন বিকেলে ডিগ্রি হাতে নিয়ে সোহেল ফোন করলেন তাঁর অন্য আর-এক স্যার, আল-আমীন মিশনের সেক্রেটারিকে, যাঁর কাছে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কিছু করার। গত বারো বছরে একবারও আর মিশনমুখো হননি। কিছু দিন পর আল-আমীন মিশন থেকে ফোন করে তাঁকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য আহ্বান জানানো হল। দীর্ঘ দিন ওই ফোনটার জন্য সোহেল অপেক্ষা করেছিলেন। 'কিছু করে দেখানো'র স্বপ্ন সোহেলের পূরণ হল, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারদের ভিড়ে আলাদা করে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলেন। সেই প্রাপ্তি কানায় কানায় পূর্ণ হল অধ্যাপনার চাকরিতে যুক্ত হওয়ার পর। ইনস্ট্রাকটর পদে যোগ দিতে পারেননি। পরের বছর ওই একই বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর পদে নিয়োগ পান নতুন করে ইন্টারভিউ দিয়ে। বেতন ইনস্ট্রাকটর পদের দ্বিগুণের বেশি। চাকরি পাওয়ার এই কয়েক বছরের মধ্যে জার্মানির আন্তর্জাতিক প্রকাশনী সংস্থা থেকে সোহেলের চারটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকায় তাঁর বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দিতে গিয়েছেন থাইল্যান্ড, দুবাই, রাশিয়া, জাপান-সহ বিভিন্ন দেশে। ২০১৪ সালে জাজান ইউনিভার্সিটি থেকে পেয়েছেন 'বেস্ট অ্যাকাডেমিক টিচিং অ্যাওয়ার্ড'। আর সবচেয়ে বড়ো সম্মান পেয়েছেন আল-আমীন মিশন থেকেই। যে-ছাত্রটা একদিন চোখের জল ফেলতে ফেলতে মিশন ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তিনিই আজ মিশনের বিভিন্ন শাখায় ঘুরে ঘুরে ছেলে-মেয়েদের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। বলছেন, 'সায়েন্স নিয়ে পড়তে না পারলে, জয়েন্টে সুযোগ না পেলে, তোমরা ভেঙে পড়ো না। সোহেল রানা সায়েন্স টানতে পারেনি, সোহেল রানা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে পারেনি— ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-অধ্যাপক হওয়ার চেয়েও জীবন অনেক বড়ো। জীবনে অনেক কিছু করার আছে। জীবনে কিছু করতে গেলে নিজেকে ফাঁকি দিয়ো না। সৎ চেষ্টা জারি রেখো, জীবন তোমাকে ফাঁকি দেবে না।' একসময় প্রায় পথ হারাতে বসা এক পথিক আজ শত শত ছেলে-মেয়েকে পথ খোঁজার গল্প শোনাচ্ছেন। সেই গল্প শুনে যদি তাঁরই মতো কোনো এক সোহেল রানা পথ খুঁজে পান, তাহলে সেটাই হবে সোহেলের জীবনের সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার। ব্যক্তিগত পুরস্কার পাওয়ার চেয়ে এটার মূল্য কি সত্যিই বেশি নয়? পাঠক, আপনি কী মনে করেন? ■

২০১০ সালে পিএইচডি সম্পূর্ণ হল। আল-আমীন মিশনের প্রথম ডক্টরেট হওয়ার গৌরব অর্জন করলেন সোহেল। ডিগ্রি পাওয়ার দিন বিকেলে ডিগ্রি হাতে নিয়ে সোহেল ফোন করলেন তাঁর অন্য আর-এক স্যার, আল-আমীন মিশনের সেক্রেটারিকে, যাঁর কাছে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কিছু করার। যে-ছাত্রটা একদিন চোখের জল ফেলতে ফেলতে মিশন ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তিনিই আজ মিশনের বিভিন্ন শাখায় ঘুরে ঘুরে ছেলে-মেয়েদের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন।

প্রতি বছর মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক-সহ নানা পরীক্ষা হয়। ফল বেরোলে সংবাদপত্রে নাম ওঠে কোনো কোনো ছাত্র-ছাত্রীর। গর্বিত হন বাবা-মা। গৌরব বাড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও। কিন্তু, র‍্যাঙ্ক করা ছাত্র-ছাত্রীর সাফল্যের পেছনে কী রসায়ন কাজ করে? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই-বা কী ভূমিকা? এই সংখ্যায় বলছে ২০১৬ সালের উচ্চ-মাধ্যমিকে রাজ্য স্তরে ষষ্ঠ স্থানাধিকারী (আল-আমীন মিশনের মধ্যে প্রথম)

তহমিনা পারভিন

মিশনে না এলে ফল এত ভালো হত না হয়তো

২০১৬ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৭ লক্ষ ৭৯ হাজার ৪৫৩ জন। ৪৯৫ নম্বর পেয়ে মেধা-তালিকায় সবার ওপরে স্বাগতম হালদার। অন্যদিকে আল-আমীন মিশন থেকে ২০১৬ সালে পরীক্ষা দিয়েছিল ১৫৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী। ১৫৩৫ জনের মধ্যে ৪৮৭ নম্বর পেয়ে মিশনের মধ্যে প্রথম এবং রাজ্য স্তরে ষষ্ঠ হয়েছে তহমিনা পারভিন। আল-আমীন মিশনের ৩০ বছরের ইতিহাসে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ সাফল্য এটাই। কথা বলা যাক তার সঙ্গে।

● বিভিন্ন গণমাধ্যম মারফত দর্শক বা পাঠক হিসেবে অনেকে হয়তো তোমার সম্পর্কে জেনেছেন কিছুটা। তবু আরও একবার 'আল-আমীন বার্তা'র পাঠকদের জানাও তোমার পারিবারিক পরিচয় সম্পর্কে।

❑ আমার বাড়ি কোচবিহার জেলার দিনহাটা থানার বড়ো নাটাবাড়ি গ্রামে। আব্বার নাম আয়ুব আলি মিঞা। ব্যাবসা করেন। মা রুনা বিবি গৃহবধূ। আব্বা-মার দুই সন্তানের অপরজন রোমানা ইয়াসমিন, পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে।

● আব্বা ব্যাবসা করেন বলছ, কী ব্যাবসা?

❑ ব্যাবসার সঙ্গে চাষবাসও জীবিকা আমাদের পরিবারের। আমাদের যৌথ পরিবার। চাচাদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকি। আমাদের এলাকায় তামাক পাতার চাষ হয়। সেই পাতা নিয়ে বড়ো ব্যবসায়ীদের বিক্রি করেন আব্বা।

● তামাক পাতা মানে কি বিড়ির পাতা?

❑ না, বিড়ির পাতা নয়। তিন-চার রকমের তামাক পাতা হয়, তার এক রকমের হবে। আমি জানি না সবটা।

● তোমাদের গ্রামের সকলেরই জীবিকা তামাক পাতা চাষ?

❑ না, তামাক পাতা ছাড়া ধান, আলু চাষ হয়। চাষবাসই প্রধান জীবিকা। দু-চারজন ছোটোখাটো ব্যাবসা করলেও চাকরিজীবী একজনও নেই।

● এবার পড়াশোনা বিষয়ে বলো। প্রাথমিক পড়াশোনা কোথায় করেছ?

❑ আমি ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পঞ্চম শ্রেণিটাও গ্রামের হাই স্কুলে। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রহমতে আলম মিশনে। একাদশ-দ্বাদশ আল-আমীন মিশনে।

● সাধারণ স্কুল ছেড়ে আবাসিক মিশনে এলে কেন, কীভাবে এলে?

❑ আমার মামা আসাদুজ্জামান আল-আমীন মিশনের প্রাক্তন ছাত্র। বর্তমানে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ হওয়ার লক্ষে এমডি করছেন। মামার ডাক্তারিতে সুযোগ পাওয়ার পর থেকেই মায়ের ইচ্ছে ছিল আমাকেও আল-আমীন মিশনে পড়াবেন।

● তোমার মামা আল-আমীন মিশনে কেমন রেজাল্ট করেছিলেন?

❑ মামা বরাবরের মেধাবী। মাধ্যমিকে ভালো ফল করার পর নানাজি ইলেভেনে মামাকে আল-আমীন মিশনে ভর্তি করেন। নানা বাঁকুড়ার একটি ব্যাঙ্কে দীর্ঘদিন ম্যানেজার ছিলেন। তিনিই আল-আমীন মিশনে নিয়ে আসেন মামাকে। মামা উচ্চ-মাধ্যমিকে ৮৬ শতাংশের মতো নম্বর পেয়েছিলেন। জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে মামার র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ১৯৯। এন আর এস মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস করে এখন এমডি করছেন।

● মিশনে কীভাবে এলে?

❑ ক্লাস সিক্সে প্রথমে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান শিশু বিকাশ একাডেমিতে ভর্তি হয়েছিলাম। বাড়ি থেকে ওখানে যাতায়াত করতে অসুবিধা হওয়ায় এক

মাস পর রহমতে আলমে চলে আসি।

● রহমতে আলম তো তোমাদের বাড়ি থেকে আরও দূরে—

❑ কিন্তু যাতায়াত ব্যবস্থা অনেকটা সুবিধাজনক।

● কেমন পড়াশোনা করতে রহমতে আলমে?

❑ প্রথম দিকে থার্ড হতাম। নাইন-টেনে সেকেন্ড হয়েছিলাম।

● মাধ্যমিকে কীরকম নম্বর পেয়েছিলে?

❑ ২০১৪ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিলাম। ৯১ শতাংশ নম্বর ছিল।

● ভালোই তো হয়েছিল, তবু ওখান থেকে চলে এলে কেন?

❑ হ্যাঁ, ভালোই হয়েছিল বলা যায়। ওঁরা বেতনে ছাড়ও দিয়েছিলেন আমার। তবু এসেছিলাম আরও ভালো ফল করতে হবে— এ-কথা ভেবে। আসলে অন্যান্য মিশনের ছেলে-মেয়েদের কাছে আল-আমীন মিশনের একটা আলাদা ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে। এখানে ভালো ছেলে-মেয়েরা পড়ে, দুর্দান্ত রেজাল্ট হয়— এরকম একটা ভাবমূর্তি।

● আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয়ে কীরকম লাগল?

❑ ভালো। সবকিছুই ভালো লেগেছে।

● আল-আমীন মিশনে না এলে কি এত ভালো রেজাল্ট হত?

❑ হত না হয়তো। কারণ, রহমতে আলমে যেভাবে পড়ে এসেছিলাম সেইভাবেই পড়তাম। ওখানে আমি নিজে ভালো করে পড়াশোনা করতে সচেস্ট হইনি। একই পরিবেশের মধ্যে পাঁচ বছর পড়ায় একটা অভ্যাস তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেই অভ্যাসটার বদল হত না আল-আমীন মিশনে না এলে। আল-আমীন মিশনের পরিবেশে এসে পড়াশোনার প্রতি আরও আগ্রহ বাড়ল। কিছু দিন পরে যখন ক্লাসের বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় চলে এলাম, তখন সেটা ধরে রাখা বা আরও ভালো করার চেস্টা শুরু হল। ভালো রেজাল্ট করার পিছনে এই পরিবর্তনটাই বেশি কাজ করেছে মনে হয়।

● আল-আমীন মিশনে কেমন রেজাল্ট হত?

❑ প্রথম ক্লাস টেস্টে থার্ড হয়েছিলাম। তারপর ইলেভেনের ফাইনাল পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম, ছেলে-মেয়ে উভয়ের মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছিলাম। ক্লাস টুয়েলভে প্রতিটা পরীক্ষায় ছেলে-মেয়ে উভয়ের মধ্যে প্রথম হয়েছি।

● উচ্চ-মাধ্যমিকে রাজ্য স্তরে ষষ্ঠ হয়েছ। তোমার বিষয়ভিত্তিক নম্বরটা জানতে চাইছি।

❑ বাংলায় ৯৭, ইংরেজিতে ৮৫, অঙ্কে ১০০, ভৌতবিজ্ঞানে ৯৭, রসায়নে ৯৯, জীবনবিজ্ঞানে ৯৪। বেস্ট ফাইভ হিসেবে সবচেয়ে ভালো ফল করা পাঁচ বিষয়ের নম্বর ধরার জন্যই র‍্যাঙ্ক হয়েছে।

● আর ৮ নম্বর পেলে প্রথম হতে পারতে। কী মনে হয়, কেন পারলে না?

❑ আরও পারফেক্টনেস আনতে হত। এর জন্য প্র্যাকটিস বাড়াতে হত। প্র্যাকটিস করে বার বার স্যার-ম্যামদের দেখিয়ে নিলে পারফেক্টনেসটা বাড়ে। র‍্যাঙ্ক হওয়ার ক্ষেত্রে পরীক্ষার সেন্টারের পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ।

● কীভাবে পড়াশোনা করতে? রুটিন ছিল কোনো?

❑ সেরকম কোনো রুটিন ছিল না। ছোটোবেলায় দু-একবার রুটিন মেনে পড়াশোনা করার চেস্টা করেছি। মেনটেইন করতে পারতাম না বলে আর করিনি। ক্লাসটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। কোচিংয়ের ওপর খুব বেশি নির্ভর করলে সেল্ফ স্টাডি কমে যায়। আর খুব প্র্যাকটিস করতাম। একটা থিয়োরি পড়লাম, তারপর তা থেকে কতরকম প্রশ্ন আসে, সেটা দেখতাম।

● মেধা-তালিকায় নাম থাকায় নিশ্চয় অনেক মিডিয়া তোমায় নিয়ে খবর করেছে, ইন্টারভিউ দেখিয়েছে ...

❑ হ্যাঁ। ২৪ ঘণ্টা, ই টিভি, নিউজ বাংলা, কলকাতা দূরদর্শন ইত্যাদি টিভি চ্যানেলে দেখিয়েছে। টাইমস অব ইন্ডিয়া, কলম, আখবর-ই-মাশরিক-সহ বিভিন্ন ইংরেজি, উর্দু, বাংলা কাগজে খবর হয়েছে। সব দেখিনি। শুনেছি অন্যদের কাছ থেকে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। তখন বেশি ভাবিত ছিলাম কী নিয়ে পড়ব।

● কী পড়ছ এখন?

❑ প্রথমে ঠিক করেছিলাম কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়ে রিসার্চ করব। এটা অনেক গণমাধ্যমকেও জানিয়েছিলাম। পরে সিদ্ধান্ত বদল করেছি। এখন জয়েন্ট এন্ট্রান্সের কোচিং নিচ্ছি ডাক্তারি পড়ার লক্ষ্যে, আল-আমীন মিশন থেকেই।

● সিদ্ধান্ত বদল করলে কেন?

❑ আব্বা-মার ইচ্ছে ডাক্তার হই। তা ছাড়া দেখলাম ডাক্তারি লাইনে পড়লে ভবিষ্যতে রিসার্চ করা বা কলেজে পড়ানো— সবই করতে পারব। সে-ক্ষেত্রে আমার ইচ্ছে আর আব্বা-মা সকলের ইচ্ছেই পূরণ করতে পারব।

● তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হোক— 'আল-আমীন বার্তা'র পক্ষ থেকে আগাম শুভেচ্ছা রইল।

❑ ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে।

সেরার পরামর্শ

❖ মিশনের শিক্ষকদের ক্লাসগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে করতে হবে।

❖ যেকোনো পরীক্ষা দিতে গেলে সিলেবাসটা খুব ভালো করে জানতে হবে, অন্তত খুঁটিয়ে পড়তে হবে এবং সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ক্ষেত্রেও একই কথা।

❖ যেকোনো বিষয়ের যেকোনো টপিকের ওপরে পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে এবং পড়াশোনার মধ্যে নিজস্বতা আনতে হবে।

❖ ফিজিক্স, কেমিস্ট্রিতে শুধু থিয়োরি পড়লেই হবে না, থিয়োরি ভালো করে বুঝে তার রিলেটেড প্রশ্ন-উত্তর অভ্যাস করতে হবে। তবেই পরীক্ষায় সমস্যার সমাধান করতে সুবিধে হবে।

❖ গণিতে যেমন প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে, তেমনি গণিতেরও কিছু জিনিস মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ কোনো এক ধরনের অঙ্কের নিয়মটা খুব ভালো করে জানতে হবে। আর বাংলাতে নোট বেস পড়লে হবে না। টপিকের প্রত্যেকটা লাইন প্রত্যেক শব্দকে ভালো করে বুঝে নিতে হবে, যাতে যেকোনো জায়গার প্রশ্নের উত্তর করা যায়।

❖ কোনো কিছু পড়ার পর সেটা আবার পড়তে হবে। এটা খুব সাহায্যকারী, মনে রাখতে সুবিধে হয়।

❖ সবসময় বি পজেটিভ থাকতে হবে। ফেলিওরকে সাকশেসের ধাপ ভাবতে হবে।

❖ সায়েন্সের সাবজেক্টের ক্ষেত্রে বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং বার বার রিভিশন করতে হবে।

❖ সবচেয়ে বড়োকথা, পড়ার পরে ভাববে না যে, কতক্ষণ পড়লাম, ভাববে কতটা পড়লাম। জোর করে পড়বে না। কিন্তু যতক্ষণ পড়বে, পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে পড়বে।

❖ আর আল্লাহ্‌র ওপর সবসময় পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা রাখবে। তুমি চেস্টা করবে, পরিশ্রম করবে, কিন্তু ফলের আশা করবে না। ফল দেওয়ার মালিক আল্লাহ্, তিনি যা করবেন ভালোই করবেন। ■

বিচিত্র এই বিশ্বে কত তথ্য আর তত্ত্ব, তার সীমা নেই শেষ নেই কোনো। এই বৈচিত্র্যের কারণে জগৎ অপার আনন্দময় ও বিস্ময়ের। এসবের কোনোটা সংবাদ শিরোনামে আসে, কোনোটা আসে না। এমনই সব গুরুত্বপূর্ণ টুকরো খবর নিয়ে এই পাতা। লিখছেন

ফরিদা নাসরিন

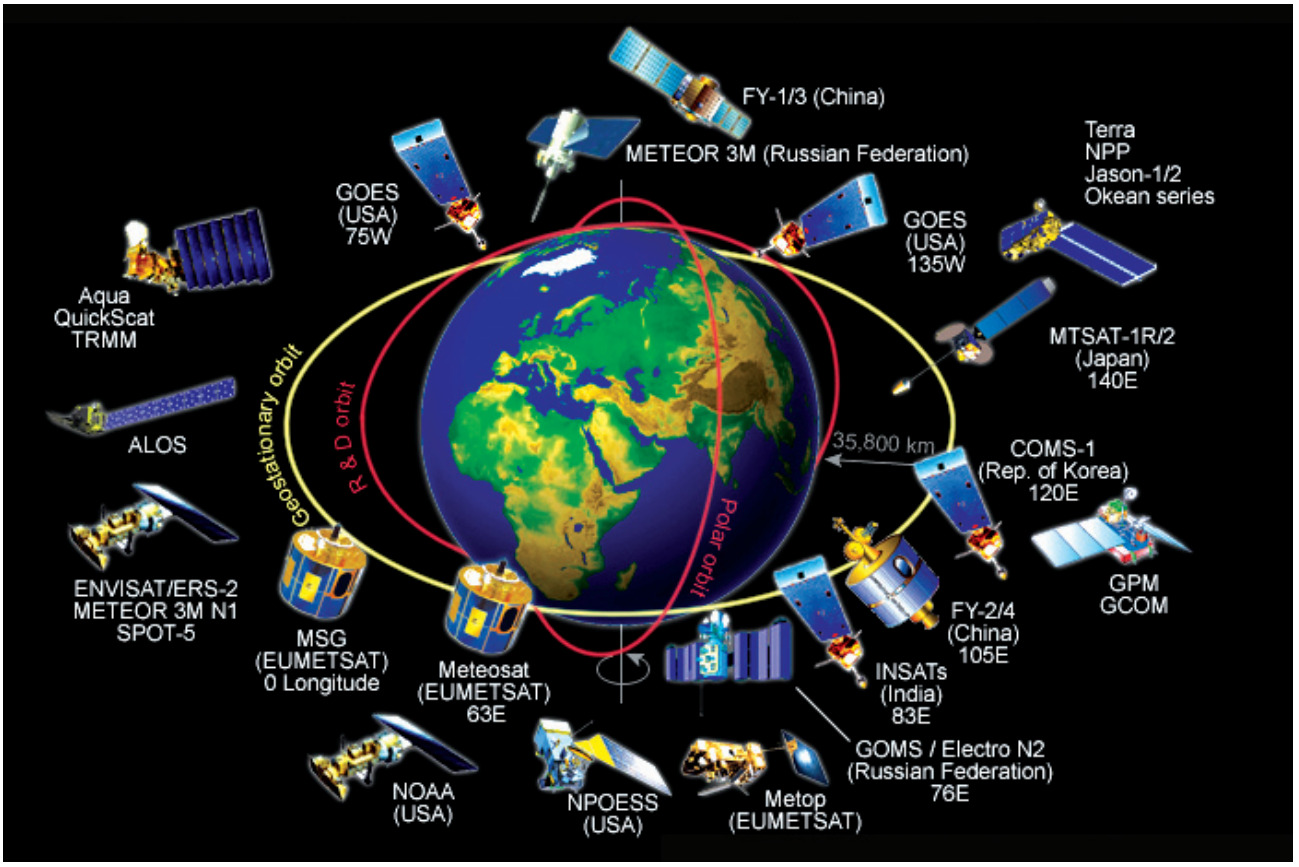

আকাশের আবর্জনা

দিনে শুধু নীল আর নীল। আর গনগনে সূর্য। আর মেঘের আনাগোনা। কখনো ফ্যাকাশে চাঁদ। একটা এরোপ্লেন গুঁঙিয়ে উড়ে গেল। এই হচ্ছে দিনের আকাশ। কিন্তু রাতে?

অগণন তারা। কোনোটা অতি উজ্জ্বল, কোনোটা মিটমিটে। কত তাদের নাম। কত ঝিকিমিকি। খালি চোখে এটুকুই আমরা দেখি। আর দেখি, কোনো কোনো তারা অন্য তারাদের থেকে সরে সরে যাচ্ছে। একটু যেন বেশি গতি। এগুলো কী?

এগুলো মানুষের তৈরি উপগ্রহ। পৃথিবীর কক্ষপথে আকাশে ঘুরছে। এদের কত কাজ! নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যস্ত। কেউ কেউ আবার এইটুকুই করছে, যা আমাদের নিত্যদিনের কাজের সহায়ক। এরা ইন্টারনেট, টেলিফোন ইত্যাদি যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখছে।

নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে এরকম কত উপগ্রহ আমরা মহাকাশে পাঠিয়েছি? নিজেদের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে মহাকাশকে নোংরা করে ফেলিনি তো? দেখা যাক।

১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর প্রথম মহাকাশযান পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে মহাশূন্যে পাড়ি দিয়েছিল। নাম ছিল তার স্পুটনিক। পাঠিয়েছিল তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন। তারপর থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ছোটো-বড়ো এবং সফল-অসফল মিলিয়ে মোট ৭৯৫৫-টি মহাকাশযান ওই নীল আকাশে পাঠানো হয়েছে।

আমাদের কক্ষপথের বাইরে তাকালে দেখব, চাঁদ একটা বড়ো আকর্ষণ। সেখানে এই মুহূর্তে একাধিক উপগ্রহ গবেষণা চালাচ্ছে। বুধে একটি, শুক্রে একটি, মঙ্গলে তিনটি এবং শনি গ্রহে একটি উপগ্রহ ঘুরছে, যা মানুষের তৈরি। আরও কয়েকটি মহাকাশযান সৌরজগৎ ছাড়িয়ে মহাশূন্যে পাড়ি দিয়েছে। যেমন ২০১৩ সালে অসীমতার দিকে উড়ে গেছে মার্কিন মহাকাশযান ভয়েজার।

বহু উপগ্রহ ধ্বংস হয়েছে শূন্যে আর তাদের ধ্বংসাবশেষের অসংখ্য টুকরো ঘুরছে মহাকাশে।

মাটিতে দাঁড়িয়ে আকাশকে আমরা নির্মল দেখি। দেখি আদিম, অসীম এক শূন্যকে। আসলে কিন্তু আমাদের পৃথিবীর চারপাশে অসংখ্য টুকরো

নিজের নিজের কক্ষপথে তীব্র গতিতে ঘুরেই চলেছে। এদের বলা হচ্ছে ‘স্পেস জাঙ্ক’। নাসার অরবিটাল ডেব্রিস প্রোগ্রাম অফিস জানাচ্ছে, এদের সংখ্যা এক থেকে দশ সেন্টিমিটার ব্যাসের প্রায় পাঁচ লক্ষ টুকরো এবং দশ সেন্টিমিটারের বেশি ব্যাসের প্রায় একুশ হাজার টুকরো। আর এদের গতি? ঘণ্টায় প্রায় সতেরো হাজার মাইল! এই গতিবেগে কোনো ধ্বংসাবশেষের একটা রঙের কণাও যদি ধাক্কা মারে কোনো টুকরোকে বা মহাকাশযানকে, ভাবতে পারি কি যে কতটা বিপদ হতে পারে?

এত সব বিপদ মাথায় নিয়ে আমরা প্রতি রাতে ঘুমোতে যাচ্ছি বা দিনে নিশ্চিন্তে কাজকর্ম করছি! যেমন নোংরা করছি বাড়ির চারপাশকে আর শহরকে আর পৃথিবীকে, তেমনই নোংরা করেছি এবং করে চলেছি আমাদের একদা-স্বপ্নের মহাকাশকেও।

মোটা হওয়ার অপকারিতা

যত দিন যাচ্ছে, দুনিয়ার মানুষ তত মোটা হচ্ছে। কী গরিব, কী ধনী— সব দেশই যেন মোটা হওয়ার প্রতিযোগিতায় ঢেলে নেমে পড়েছে। মানুষ এই যে মোটা হয়েই চলেছে, এর কারণ কী? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর কারণগুলো চিহ্নিত করা মোটেই শক্ত নয়। বেশির ভাগ মানুষ ঘুরছে দুনিয়ার শহরগুলোতে। সেখানে চারিদিকে ছড়ানো অস্বাস্থ্যকর খাবারের ডাঁই, চটজলদি পাওয়াও যায় আর দামও এমন কিছু বেশি নয়। একদিকে শরীরে ঢুকছে এইসব জাঙ্ক ফুড, অন্যদিকে কায়িক পরিশ্রমের সুযোগ তেমন নেই। চেয়ার-টেবিলের বাঁধনে জীবন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা যেন। হয়তো-বা সারা দিনই কেটে যাচ্ছে কমপিউটারের সামনে। অথচ সারা দিনে যতটুকু ক্যালোরি তার শরীরে ঢুকছে, শারীরিক পরিশ্রম করে ততটা খরচ করছে না। ফলে শরীরে জমছে মেদ।

বাড়তে বাড়তে ২০১৬ সালের হিসেব অনুযায়ী পৃথিবীর প্রায় ৪০ শতাংশ পূর্ণবয়স্ক মানুষই স্থূলকায় বা মোটা। কতটা ওজন হলে একটা মানুষকে স্থূলকায় বলব? মানুষের স্থূলতার পরিমাপ কীভাবে করব?

বডি মাস ইনডেক্স বা বিএমআই পদ্ধতিতে আমরা নিজেদের স্থূলতার পরিমাপ সহজেই করে নিতে পারি। কেমন করে? নিজের শরীরের ওজনকে শরীরের উচ্চতা দিয়ে ভাগ করে। ধরা যাক, আমার উচ্চতা ১.৭ মিটার। ওজন ৮০ কিলোগ্রাম। প্রথমে আমার উচ্চতার বর্গ করে নিতে হবে। অর্থাৎ ১.৭-কে ১.৭ দিয়ে গুণ করতে হবে। হল ২.৮৯। এবার ৮০-কে ২.৮৯ দিয়ে ভাগ করলেই বেরিয়ে আসবে স্থূলতার পরিমাপ, যা আমার বিএমআই। কত হল? ২৭.৬৮। এটাকে বলে kg/m2। অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মতভাবে লিখতে হবে— ২৭.৬৮ kg/m2।

এই যে মাপ পাওয়া গেল, এটা কি স্বাভাবিক ওজন? না, এটা বেশি। অর্থাৎ আমি ওবেসিটিতে বা স্থূলতায় ভুগছি।

স্বাভাবিক ওজনের সূচক ১৮.৫ থেকে ২৪.৫ বিএমআই। বেশি ওজনের সূচক ২৫ থেকে ২৯.৫। বিপজ্জনক স্থূলতার সূচক ৩০ বা তার বেশি।

অধিকাংশ মার্কিনি মনে করে, তাদের দেশের মানুষই সম্ভবত বেশি মোটা। কিন্তু পরিসংখ্যান তা বলছে না। ২০১৬ সালের একটা হিসেব হাতের কাছে রয়েছে, যা চোখে পড়ার মতো। দেখা যাচ্ছে, সব দেশকে এবার টেক্কা দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের ছোট্ট দেশ কুয়েত। মোটাদের সংখ্যা এখন সব থেকে বেশি ওই দেশটিতেই। একা কুয়েত কেন, মোটাদের তালিকায় মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশ রয়েছে এক থেকে দশের মধ্যে। মাটির তলার পেট্রোল ওইসব দেশকে দিয়েছে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ। বিশেষজ্ঞদের ধারণা— দেশগুলো উন্নপ্রবণ। অতিরিক্ত ঠান্ডা পানীয় খেয়ে থাকে, যাতে রয়েছে সোডা। চিনির পরিমাণও কম নয়। এ ছাড়া জাঙ্ক ফুড নির্বিচারে খায়।

যেমন কুয়েত। মোট জনসংখ্যা ৪,৩৪৮, ৩৯৫ জনের মধ্যে ৪২.৮ শতাংশই স্থূল। পৃথিবীর জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ যেখানে স্থূল, সেখানে কুয়েতে এমন মানুষের সংখ্যা তার তিন গুণ! দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সৌদি আরব। সৌদি আরবের ৩৫.২ শতাংশ মানুষ স্থূলতায় বা ওবেসিটিতে আক্রান্ত। সেখানে প্রতি তিন জন মহিলার একজন স্থূল হওয়ার কারণে নানা রোগে ভুগছে। তৃতীয় বেলিজ, মধ্য আমেরিকার ছোট্ট একটি দেশ, যেটি মেক্সিকোর গায়ে লেগে রয়েছে। চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ স্থানে যথাক্রমে মিশর, জর্ডন এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। পিছোতে পিছোতে দশম স্থানে চলে গিয়েছে আমেরিকা।

স্থূলতা বা ওবেসিটি একটা মারাত্মক সমস্যা। এটি অনেক অসুখের কারণ। হৃদরোগ, মধুমেহ বা ডায়াবেটিস, অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, অ্যাজমা, ক্যানসার, অস্টিওআর্থারাইটিস ইত্যাদি অসুখগুলো স্থূলতা অনেক সময় ডেকে আনে অথবা বিপদে ফেলে। মোটা হওয়া তাই গৌরবের ব্যাপার নয়, বরং বিপদের।

বৃহত্তম মরুভূমি

মহাকাশ থেকে দেখলে আমাদের প্রিয় গ্রহটিতে জলই বেশি দেখা যায়। অর্থাৎ সমুদ্র। আমরা জানি, পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৭১ শতাংশই জলে ঢাকা। বাকি মাত্র ২৯ শতাংশ স্থল। এই স্থলভাগটুকুর মধ্যে আবার একের তিন অংশই মরুভূমি।

মরুভূমি বলতেই চোখে ভাসে মাইলের পর মাইল বালি আর বালির ঢেউ। আর গনগনে সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ। তার নীচে উটের সারি। কাঁটাঝোপ।

পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি বললেই আমাদের মনে পড়ে সাহারার কথা। প্রায় গোটা উত্তর আফ্রিকা জুড়ে এর বিস্তার। কত কত দেশের স্থল জুড়ে পুরু বালি আর বালি। সেই বালির দেশেও মানুষ থাকে। সেখানকার জীবজন্তু, শহর, রাজধানীর কথা আমরা জানি। কোথাও কোথাও কিছু গাছপালাও রয়েছে। বিদ্যুতের তার চলে গেছে ঊষর মরুভূমির ওপর দিয়ে শত শত মাইল। এই মরুভূমির ওপর মানুষ তৈরি করেছে পৃথিবীর বিস্ময়— পিরামিড। সমগ্র সাহারা জরিপ করলে দেখব, এর আয়তন নব্বই লক্ষ বর্গকিলোমিটার। ভারতের আয়তনের (বত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার দু-শো তেষট্টি বর্গকিলোমিটার) প্রায় তিন গুণ! অবিশ্বাস্য মনে হয়।

কিন্তু সাহারার থেকেও বড়ো মরুভূমি আমাদের পৃথিবীতেই রয়েছে। আর সেটা অনেক বড়োও। এখন আমরা যাব সেই ভয়ংকর মরুভূমিতে, যার নাম আন্টার্কটিক ডেসার্ট বা আন্টার্কটিক মরুভূমি। কিন্তু পুরু বরফে ঢাকা আন্টার্কটিকাকে কেন মরুভূমি বলব? তার আগে জেনে নিই, আন্টার্কটিকা জায়গাটি কেমন।

এত দিনে সবাই কিছু কিছু জেনে ফেলেছি আন্টার্কটিকার কথা। তবু কয়েকটি দরকারি তথ্য এখানে রইল।

বেশি দিনের কথা নয়। সুদূর দক্ষিণ মেরুতে একটি স্থলভূমি যে আছে, সেটির অস্তিত্ব মানুষ জানতে পারে এই সেদিন, অর্থাৎ ১৮২০ সালে। ১৯১১ সালে মানুষের পা পড়ে এই চিরবরফের রাজ্যে। নাম আন্টার্কটিকা।

সাতটি মহাদেশের মধ্যে আন্টার্কটিকা আয়তনে পঞ্চম। দক্ষিণ মেরুতে অবস্থিত মহাদেশটি প্রায় গোলাকার, যদিও পশ্চিম আন্টার্কটিকার একটা বাঁকা আর লম্বা হাত এগিয়ে গেছে দক্ষিণ আমেরিকার লেজের দিকে। সবচেয়ে কাছের স্থলভূমি ওই বাঁকা লেজটিই, যেটি চিলি আর আর্জেন্টিনা লম্বা হয়ে ভাগ করে নিয়েছে। দূরত্ব? এক হাজার কিলোমিটার। পৃথিবীর সবচেয়ে অশান্ত সমুদ্র এটি। নাম— ড্রেক প্যাসেজ। পূর্বে অস্ট্রেলিয়া রয়েছে আড়াই হাজার কিলোমিটার দূরত্বে। দক্ষিণ আফ্রিকা চার হাজার কিলোমিটার। গ্রীষ্মকালে আয়তন ১৪.২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার। শীতকালে তীরবর্তী সমুদ্রের ওপর বরফ জমে আয়তন বাড়িয়ে দেয় অনেকটা।

পৃথিবীর শীতলতম মহাদেশ এটি। শতকরা ৯৮ শতাংশের বেশি এলাকা বরফে ঢাকা। পৃথিবীর বিশুদ্ধ জলের ৭০ শতাংশই এখানে রয়েছে বরফ হয়ে। বরফের আস্তরণ দেড় কিলোমিটারের বেশি পুরু।

তাহলে কেন আন্টার্কটিকাকে মরুভূমি বলব?

যে-অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরে দু-শো চুয়ান্ন মিলিমিটার বা দশ ইঞ্চির কম, সেই অঞ্চলকে মরুভূমি বলা হয়। কম বৃষ্টিপাতের জন্যে বাতাস হয় বিশুষ্ক। আর্দ্রতা থাকে না বললেই চলে।

আন্টার্কটিকা মহাদেশের ভেতরের দিকে বছরে তুষারপাত হয় মাত্র পঞ্চাশ মিলিমিটার বা দুই ইঞ্চির মতো, যা সাহারা মরুভূমির চেয়ে অনেক কম। তীর-এলাকায় সবচেয়ে বেশি দু-শো মিলিমিটার বা আট ইঞ্চি। ফলে আর্দ্রতা নেই বললেই চলে।

সারি সারি উট নেই। উন্নতা নেই। দলবদ্ধ পেঙ্গুইনের চমৎকার এই ভূখণ্ডটি ভূগোলের পরিভাষায় তবু মরুভূমিই। ■

শিখরের কাছাকাছি যারা, যারা উজ্জ্বলতর জীবন-জীবিকার জগতে একদিন পৌঁছোবে অবশ্যই— সেই সম্ভাবনাময়দের নিয়ে এই পাতা। লিখেছেন

সেলিম মল্লিক

ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা

ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা: সময়ের এমন আর্তি চিরকাল সবুজ প্রাণকে প্রদীপ্ত করে। আত্মদীপের আভাসে তারা অচল অন্ধকারের দুস্তর পথ অতিক্রম করে দুর্বার গতিতে ভেঙে দিতে চায় সমস্ত রুদ্ধতার প্রাকার। বন্ধ দুয়ার খুলে জ্বেলে দিতে চায় চিত্তচেতনের আলো। এমন আলোকে অভিবাদন জানানোর জন্যে পৃথিবী আকুল হয়ে অপেক্ষা করে। কোথাও স্ফুলিঙ্গ দেখা গেলে সে চমকিত হয়ে ওঠে। কারণ, সে জানে, এভাবেই হয়েছে, হবে, শাশ্বত সূর্যোদয়।

আমরা এখন কথা বলব চারটি নবোদিত আলোর কণিকা নিয়ে। কাঁচা আলোর এই কণাগুলি মহামূল্য মোহরের চাইতেও দামি। কারণ, এ-সোনা পতিত জমিন আবাদ করে ফলেছে।

এমন জমিন এতকাল পতিত পড়েছিল। কে জানত আবাদ করলে ফলবে সোনা। স্বীকার না করে পথ নেই, আল-আমীন মিশন তামাম বাংলার মুসলমান সমাজে শিক্ষার বান এনে দিয়েছে। তাই মন উচ্চস্বরে বলতে চাইছে: এবার মরা গাঙে বান এসেছে, ভাসাও ভাসাও ভাসাও তরী।

একদিন অনেক রাত। মধ্যরাত হবে। গিয়েছি মিশনের সূর্যপুর বালক শাখাতে। পরদিন সকালে দু-জন ছাত্রের সঙ্গে কথা বলব। কথা বলার ভেতর দিয়ে জেনে নেব তাদের পরিবার, পরিজন, পরিস্থিতি, পড়াশোনা আর স্বপ্ন। অত রাতে গিয়ে দেখি, হস্টেলের সমস্ত ঘরে বারান্দায় আলো জ্বলছে। মাঝে মাঝে এক-আধটা কোমল গলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। নইলে সমস্ত পরিবেশ নীরব। সেই নীরবতার মধ্যে চোখ জ্বেলে তখনও পড়ে চলেছে ওই শাখার পড়ুয়ারা। তারা যে-স্বপ্ন দেখছে, তা তো ঘুমের আবছায়ায় নয়, যে-স্বপ্ন জাগরণের উজ্জ্বলতার মধ্যে দেখতে হয়। তাই তারা দুই চোখের পাতা আর বইয়ের পাতা খুলে ঠেলে সরিয়ে রেখেছে ঘুম। তারা জেগে আছে। জেগে

এমন জমিন এতকাল পতিত পড়েছিল। কে জানত আবাদ করলে ফলবে সোনা। স্বীকার না করে পথ নেই, আল-আমীন মিশন তামাম বাংলার মুসলমান সমাজে শিক্ষার বান এনে দিয়েছে।

আছে আমাদের স্বপ্নের সন্তানেরা। পরের সকালে নয়। ওই অত রাতে কথা হল দু-জনের সঙ্গে। মনে আছে, আমার চোখের সামনে দুই পড়ুয়ার চোখ যেন স্বচ্ছ নীল নক্ষত্রের মতো। অমন চোখের দিকে তাকিয়ে দূর কোনো গন্তব্যের হদিশ পাওয়া সম্ভব। ওদের সঙ্গে কথা বলার আবেসে আমারও চোখ থেকে চলে গেছে নিদ্রালু ভাব। ওরা যেন মনে করিয়ে দিল— জাগতে হবে। জেগে থেকে দেখতে হবে সূর্যের উদয়।

প্রথমে কথা হল ফিরোজ হোসেনের সঙ্গে। দ্বাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান নিয়ে

ফিরোজ হোসেন।

পড়ছে। সূর্যপুর শাখাতে আসার আগে ছিল মিশনের পাথরচাপুড়ি শাখায়। সেখানে ২০১০ সালে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হয়। তার আগে পড়ত তাদের গ্রাম বীরভূম জেলার বুধিগ্রামের একটি স্কুলে। বরাবর সব ক্লাসে প্রথম হত।

প্রথম হলে কী হবে। ফিরোজের কথায়, আল-আমীনে না এলে লেখাপড়া বেশিদূর চালিয়ে যাওয়া কল্পনাতীত ছিল। তার বাবা নবি নেওয়াজ চাষবাস করে সামান্য উপার্জন করেন। মা ফরোজা বিবি হাঁস-মুরগি পালন করে অল্প আর-কিছু আয় করেন। দাদু মারা গিয়েছেন তার বাবা যখন ছোটো। ফলে বাবা সেই ছোটোবেলা থেকে জোয়াল কাঁধে টেনে নিয়ে চলেছেন সংসারের হাল। কী করে কী করবেন। টিউশন শিক্ষক শেখ শাখাউদ্দিনের প্রযত্নে আল-আমীনে ভর্তি। মেধাবী ফিরোজ মিশনে এসে মনের মতো পরিবেশ পেয়ে বড়ো হওয়ার আশায় বুক বাঁধতে যেন আশ্বাস পেল। স্যারেদের যত্ন আর আন্তরিকতায় পেল উত্তরণের প্রেরণা।

পাথরচাপুড়ি শাখা থেকে ২০১৫ সালে মাধ্যমিক দিয়ে পেয়েছে ৬২৭ নম্বর। অঙ্কে সর্বোচ্চ নম্বর পেলেও রসায়ন পড়তে তার সব চাইতে ভালো লাগে। আর ভবিষ্যতে হতে চায় ডাক্তার। ফিরোজ অকপটে স্বীকার করল, মিশনই তাকে প্রথম ভবিষ্যৎ নিয়ে বড়ো কিছু ভাবতে শিখিয়েছে। তার চেনা বৃত্তটাকে অনেক বিরাট করে কল্পনা করতে শিখিয়েছে। মাঠের ধারে তাদের দোতলা মাটির বাড়ি, খড়ের চালা। চারপাশে কৃষিজীবী মানুষের বাস। শুধু বৃত্ত নয়, মিশন তাকে তাদের বিত্ত ভাঙতেও নিরন্তর প্রেরণা জুগিয়ে চলেছে।

ফিরোজের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল, তখন তার পাশে চুপটি করে বসে ছিল তার সহপাঠী রামিজ রাজা। একটু পরে সে কথা বলবে। তার আগে একাগ্র হয়ে শুনছিল বন্ধুর কথাগুলো। অন্যের কথা শুনবার মনোযোগ দেখে এটা অনুমান করতে পারলাম, ফিরোজ-রামিজেরা ক্লাসে বসে নিশ্চয় শিক্ষক মহাশয়দের পড়ানোও গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে শোনে। তার সুফল এরা পরীক্ষার মানপত্রে দেখতে পায়। ভালো রেজাল্ট করার এটা একটা জবুরি পন্থা। আশা করি ফিরোজ-রামিজ সেই ফল থেকে বঞ্চিত হবে না।

রামিজও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। শাখা সূর্যপুর। বিভাগ বিজ্ঞান। মুর্শিদাবাদ জেলার মেওয়াখানা গ্রামে তার বাড়ি। বাবা নাজবুল হক রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করেন। রোজ রোজগার মাত্র আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা। রামিজের মেধা আছে, কিন্তু তার বাবার তেমন সামর্থ্য নেই যে, তাকে অর্থ জুগিয়ে বছরের পর বছর পড়াবেন। এমন পরিস্থিতি তাদের। একদিন, রামিজ তখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ছে। তার বাবা শান্তিপুরে কাজে গিয়ে, যাঁদের বাড়িতে কাজ হচ্ছিল, তাঁদেরই একজনের পরামর্শে এবং সহযোগিতায় রামিজকে আল-আমীন মিশনে ভর্তি করার উদ্যোগ নেন। ভর্তির পরীক্ষায় পাস করে রামিজ নবম শ্রেণিতে বেলডাঙা শাখায় পড়াশোনা করতে থাকে। সেখান থেকে ২০১৫ সালে মাধ্যমিক দেয়। মাধ্যমিকে সে পেয়েছিল ৫৯৯ নম্বর। তার পাওয়া নম্বরের মধ্যে জীবনবিজ্ঞানে সর্বোচ্চ। ৯৪ নম্বর। জীববিদ্যাই সব চাইতে প্রিয় বিষয়। অবসর পেলে, যখন একা থাকে, তখন অন্য কিছু নয়, না গল্পের বই পড়া, না টিভি দেখা, তার পছন্দ জীববিদ্যার বই খুলে পাতার পর পাতা পড়ে যাওয়া। আমি তার কথা শুনতে শুনতে কল্পনা করছি: তাদের টিনের একচালা বাড়ির দাওয়ায় বসে আছে রামিজ। কোলের ওপর জীববিদ্যার বই খোলা। সামনের ছোটো আঙিনা ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি অনেক দূরে। পড়তে পড়তে ভাবছে, তাকে ডাক্তার হতে হবে। ক্যানসার সেলের ওপর গবেষণা করতেই হবে। এই সংকল্প জীবিকার জন্যে নয় শুধু, জীবনের জন্যে। তার একার জীবনের জন্যে নয়, রামিজের চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে হাজার হাজার পৃথিবীবাসীর জীবন।

রামিজ রাজা।

এবার যার কথা বলব, সে সাদিয়া খাতুন। দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ছে, মিশনের মেদিনীপুর বালিকা শাখায়। সাদিয়ার বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের চালতাবান্দি গ্রাম। সেখানে তার জন্ম ১৯৯৯ সালে। আদি বাড়ি ছিল উত্তর চব্বিশ পরগনার ভাঙড়ে। দাদু ছিলেন হাফেজ। কাজের সূত্রে পশ্চিম মেদিনীপুরে এসে জায়গাজমি কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু। সাদিয়া তার গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে বুনিয়াদি শিক্ষা নিয়েছে। ২০১৫ সালে ৫৬৬ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাস করেছে কৃষ্ণপুর রহমানিয়া হাই স্কুল থেকে। সর্বোচ্চ নম্বর ছিল জীবনবিজ্ঞানে। তার বাবা মৌলানা সইদুল ইসলাম।

সাদিয়া খাতুন।

আল-আমীন মিশনের মেদিনীপুর শাখায় আরবি পড়াতেন। এই বছরই, ২৭ মার্চ পথদুর্ঘনায় মারা যান। বাবার মৃত্যু তার জীবনে একটা শূন্যতার হাহাকার এনে দিয়েছে। সে হারিয়েছে তার সব চাইতে বড়ো অবলম্বন। তার এই কষ্টের কথা কেউ বুঝবে না। তাই সে যখন খুব একা থাকে, আর মনখারাপ করে বাবার জন্যে, তখন কিছু একটা লিখতে চায়। কেউ বুঝবে না তার কথা, তাই সাদা কাগজে নিজের সঙ্গে সে কথা বলে। এটাই তার সান্ত্বনা। তার লেখা একটি কবিতা: 'পথ হারিয়ে হারিয়ে/ দিগন্ত পেরিয়ে পেরিয়ে/ যাব একদিন/ আলো-আকাশের ওপারে'।

তার বাবার আশা ছিল, সে ডাক্তার হোক। এখন তাই সে বাবার অবর্তমানে ডাক্তার হওয়ার চেষ্টাতে নিরত। এপারে বসে পরকালে চলে যাওয়া বাবাকে খুশি করার এ ছাড়া তার অন্য উপায় নেই। আর এমন পরিস্থিতিতে আল-আমীন তার সব চাইতে বড়ো সহায়। তাকে পড়তে হবে। নিবিড় মনোযোগে পড়ে যেতে হবে। বাকি সব দায়িত্ব আল-আমীনের। এখন সে সম্পূর্ণ ফ্রি-শিপের ছাত্রী। কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলল সাদিয়া। আর চোখ মুছে মৃদুস্বরে বলল: দুঃখ পথের আলো। প্রার্থনা করি— ওই আলোয় উদ্ভাসিত হোক তার সমগ্র জীবন।

শেষ করব তামান্না মালিতার কথা বলে। তামান্না আল-আমীনের মেদিনীপুর বালিকা শাখার দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। জন্ম ১৯৯৯ সালে। তাদের বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বনগাঁ ব্লকের গঙ্গানন্দপুর গ্রামে। বাবা রফিকুল ইসলাম মালিতা। রফিকুল সাহেবের পেশা কৃষিকাজ। নিজেদের বিঘা তিনেক চাষের জমিতে যে-ফসল হয়, তার ওপরেই নির্ভরশীল। সম্প্রতি তামান্নার মা নিলুফা ইয়াসমিন মালিতা আইসিডিএস-কর্মী হিসেবে কাজ পেয়েছেন। ২০০০ সালের বন্যায় তামান্নাদের মাটির বাড়ি ভেঙে যায়। তারপর থেকে মূলী বাঁশের বেড়ার বাড়িই ছিল তাদের আশ্রয়। এক বছর হল কোনোপ্রকারে একটা পাকাবাড়ি হয়েছে।

তামান্না মালিতা।

তামান্না বেশি দিন যে আল-আমীনে পড়ছে, তা নয়। ভর্তি হয়েছে ক্লাস ইলেভেনে। তার আগে পড়ত অম্বিকাপুর আলতাফ হোসেন হাই স্কুলে। সেখান থেকে ২০১৫ সালে মাধ্যমিক দিয়েছে। আল-আমীন যে সম্ভাবনাময় পড়ুয়াদের গড়ে নিতে জানে, তার প্রমাণ তামান্না। সে মাধ্যমিকে পেয়েছিল ৫৫০ নম্বর, অর্থাৎ ৭৮ শতাংশ। এখনকার সময়ে এটা বলবার মতো কিছু নয়। কিন্তু আল-আমীনে ভর্তি হয়ে সে এখন তার ক্লাসে প্রথম হয়। তামান্নার কথায়: 'মিশনে এসে মানসিকতাটাই পালটে গেছে। স্যার-ম্যাডামদের আন্তরিকতা প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেয়। বাড়িতে আগে পড়ার জন্যে পড়তাম। পড়াটা ছিল শক্ত কাজ। আর এখন পড়ার আনন্দে পড়তে পড়তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কীভাবে যে চলে যায়, বুঝতেই পারি না।' শুধু ভালো লেখাপড়া নয়, আল-আমীন পড়ুয়াদের মনুষ্যত্বের ভিতটা গড়ে দেয়, তা তামান্না অনুভব করছে। কেমিস্ট্রি পড়তে তার সব চাইতে ভালো লাগলেও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সে যেতে চায় কর্মজীবনে। আর আল্লা— তিনি সবসময় তার সমস্ত কাজের সঙ্গী। তিনি সঙ্গে আছেন— এই ভরসাতে যেকোনো কাজ করবার তাগিদ অন্তর থেকে আপনা হতেই আসে। এটাও আল-আমীনের এক গভীর শিক্ষা। ■

আল-আমীনের নানা আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে লেখাপড়া করছে দুঃস্থ পরিবারের অজস্র মেধাবী ছেলেমেয়েও। আল-আমীনের আশ্রয় না পেলে হয়তো হারিয়ে যেত তারা। কেমন আছে এই কচিকাঁচারা, যারা একদিন দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে বলে আল-আমীনের বিশ্বাস? নিজেই বলছে বাবনান ক্যাম্পাসের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী

মোনালিসা খাতুন

জীবনে কিছু পেতে গেলে কিছু ছাড়তে হয়

- তোমার বাড়ি কোথায়?
- শ্রীকৃষ্ণনগর বেণীপুরে। মগরাহাটের কাছে। জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।
- বাবা-মা?
- আব্বার নাম মোর্তজা মণ্ডল। প্যান্ডেলের কাজ করেন। ওই রংবেরঙের কাপড় দিয়ে সাজানোর কাজ।
- মায়ের কথা বললে না যে?
- মায়ের শুধু নামটুকুই জানি, শুনে শুনে। হাবিবা বিবি। আমার জন্মের বারো ঘণ্টার মধ্যেই মা মারা যান শুনেছি। তারপর থেকেই আমরা নানাবাড়িতে। নানা নেই। নানি আছেন আর দুই মামা। তাঁরাই আমাদের মানুষ করেছেন।
- আব্বা?
- আব্বা আমাদের দেখেন না।
- মায়ের কোনো ছবি আছে বাড়িতে?
- জানি না।
- ইচ্ছে হয়নি মায়ের মুখটা দেখার?
- বার বার হয়েছে। হয়। পাব কোথায়? একটা ছবির খোঁজ পেয়েছিলাম। পাড়ার এক বিয়েবাড়িতে নাকি একসঙ্গে ছবি তোলা হয়েছিল। খুব করে দেখতে চেয়েছিলাম। ওরা বের করে দেখায়নি। নাকি অনেক খুঁজতে হবে।
- কয় ভাই-বোন তোমরা?
- দুই। দাদা বেণীপুর হাই স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। বাড়ির কাছেই। হেঁটে গেলে পাঁচ মিনিট।
- আল-আমীনে তুমি এলে কী করে?
- আমাদের ওদিককার এক দিদি আল-আমীন মিশনে পড়ে ডাক্তার হয়েছেন। নানির মুখে শুনেছি, মা নাকি বলতেন— যদি এবার একটা মেয়ে হয়, যদি সে ডাক্তার হতে পারে— এইসব স্বপ্নের কথা। সেই থেকে নানি আর

মামাদের চেষ্টা ছিল আমাকে পড়ানোর। আমাদের ওখানে প্রাইমারি স্কুলে ভালো লেখাপড়া হয় না বলে মামারা আমাকে ভর্তি করে আদর্শ শিশু শিক্ষায়তনে। ক্লাস ফোর পর্যন্ত ওখানেই পড়েছি। ফার্স্ট থেকে ফিফথ— কিছু একটা হতাম। ঠিকই ছিল, ফাইভে আমাকে ভর্তির চেষ্টা করা হবে আল-আমীনে।

- তারপর? কী করে ভর্তি হলে?
- পদ্মপুকুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমাদের ভর্তির পরীক্ষা হয়। ভালো দিয়েছিলাম পরীক্ষা। চান্স পেয়ে ডাক পাই খলতপুর যাওয়ার। নানি আর মামার সঙ্গে গিয়েছিলাম। বেশ ভয়-ভয় লেগেছিল। বড়ো বড়ো সুন্দর বাড়ি। এত এত ছেলেমেয়ে। গার্জেন। মেলার মতো ভিড়। এত সবের মাঝে আমি একটা পুঁচকে মেয়ে। যখন ডাক এল, নানি আর মামার সঙ্গে ঢুকলাম। সেক্রেটারি স্যারের সঙ্গে কথা বলছিলেন ওঁরা। কী সব কথা হল। শেষে ঠিক হল, মাসে পাঁচশো নব্বই টাকা ফিজে আমাকে ভর্তি করা হবে। এটাই সবচেয়ে কম ফিজ। ভর্তি হয়ে বাবনানে এলাম।
- ক্লাস ফাইভের অ্যানুয়াল পরীক্ষায় কত শতাংশ নম্বর পেয়েছিলে?
- কমই পেয়েছিলাম। ৭৮ শতাংশ। প্রথম বছর তো।
- আগের স্কুলের লেখাপড়া আর আল-আমীনের— তফাত আছে কিছু?
- অনেক তফাত। এখানে পড়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায়।
- কীরকম?
- এখানে সবকিছু নিয়ম বেঁধে হয়। পড়া, খেলা, খাওয়া-দাওয়া, নমাজ, ঘুম— সবকিছু। ফলে পড়াশোনা ভালো হয়। তা ছাড়া হস্টেলে একসঙ্গে থাকি বলে সবাই আলোচনা করে পড়তে পারি।
- মিশনের প্রথম দিনের কথা মনে আছে?
- (হেসে, লম্বা করে) হ্যাঁ-অ্যা। নিয়মশৃঙ্খলা দেখে খুব ভালো লেগেছিল।
- সে-দিন রাতে একা ঘুমোতে ভয় করেনি?
- না। ওটা ছিল নমাজঘর। অনেকে একসঙ্গে ঘুমিয়েছিলাম। পরের দিন বেড পাই।
- বাড়ির চেয়ে মিশন আলাদা কীসে?
- বাড়িতে যা-খুশি করা যায়। আর তাই লেখাপড়ার সময়টাতেই কম পড়ে যায়। যেমন আমার দাদা। বাড়িতে থেকেই পড়ে। ওর তো দেখি খেলার দিকেই মন। বুদ্ধি খুব ভালো। কিন্তু পড়তে তো হবে।
- বাড়ি ছেড়ে হস্টেলজীবন যাপন করতে মনখারাপ করে না? এইটুকু তো বয়স?
- না। জীবনে কিছু পেতে গেলে কিছু ছাড়তেও তো হয়। লেখাপড়ার এমন পরিবেশ এখানকার মতো আর কোথায় পাব?
- কী করতে সবচেয়ে ভালো লাগে?
- সব কাজের চেয়ে পড়াশোনা করতে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে।
- কী পড়তে ভালো লাগে?
- ইতিহাস।
- কেন?
- আগেকার দিনের মানুষ কীভাবে বাঁচত, কী খেত— এসব আমরা জানতে পারি।
- স্কুলের বই ছাড়া অন্য বই পড়?
- পড়ি। আমার প্রিয় বই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়'।
- তোমাদের হস্টেলে খেলাধুলো হয়?
- বিকেলে। আমি ব্যাডমিন্টন খেলি। ভালো লাগে খুব।
- হস্টেলে তোমাদের রুমে কত জন থাক?
- মোট বারো জন। সবাই ক্লাস সিক্সের। সঙ্গে থাকেন রুম-টিচার কামরুন্নেসা খাতুন। তিনি বাংলার ম্যাম।

আমি মায়ের স্বপ্ন যেন পূরণ করতে পারি। শুধু ডাক্তার হওয়াই নয়, আমি যেন মানুষের মতো মানুষ হতে পারি।

- তোমার বন্ধুদের কথা বলো?
- পাশের বেডের দীনা ফারহিন আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। নানা বিষয়ে সে আমাকে সাহায্য করে। লেখাপড়া বা অন্য কিছু।
- এই যে দিনরাত দল বেঁধে থাক, একটু একা থাকতে ইচ্ছে করে না?
- করে। একা একা পড়তে ইচ্ছে করে।
- কোন শব্দ শুনতে সবচেয়ে ভালো লাগে?
- পড়াশোনার শব্দ। কেউ একা পড়ছে বা অনেকে দল বেঁধে পড়ছে— সেই শব্দ।
- খারাপ লাগে কোন শব্দ?
- ঝগড়ার শব্দ।
- কর নাকি ঝগড়া? হস্টেলে কেউ করে?
- (হেসে, মাথা নামিয়ে) না। তেমন সুযোগই নেই।
- তোমাদের তো গার্লস হস্টেল। নিশ্চয়ই বিশেষ সাবধানতা নেওয়া হয়?
- মেন গেটে চব্বিশ ঘণ্টা গার্ড। দিনে একজন, রাতে একজন। বাইরের কেউ এলে স্যারের কাছে, গার্ড আগে পারমিশন নেন, তারপর তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়।
- বড়ো হয়ে তুমি কী হতে চাও? 'ডাক্তার হব' বোলো না যেন!
- (এবার হেসে, একটু চুপ থেকে বলে) ডাক্তারই হব।
- কেন?
- মাকে তো আমি দেখিনি। নানির মুখে মায়ের স্বপ্নের কথা শুনেছি। সে-স্বপ্ন আমার জন্মের আগের। নানিও আশা করেন, আমি মায়ের স্বপ্ন যেন পূরণ করতে পারি। শুধু ডাক্তার হওয়াই নয়, আমি যেন মানুষের মতো মানুষ হতে পারি। ■

এটি নানান টুকরো টুকরো বিভাগের সমন্বয়। ভাষা, দেশ, বই, মহাকাশ, কী নেই! রত্নে ভরা আলিবাবার গুহা যেন।

দেশ

আ জা র বা ই জা ন

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের ট্রান্সককেশীয় অঞ্চলের প্রায় চার হাজার বছরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতিতে লালিত দেশ আজারবাইজান। আয়তন ৮৬,৬০০ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৯৭ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮৩০ জন। পূর্বে রয়েছে কাস্পিয়ান সাগর, উত্তরে রাশিয়া, উত্তর-পশ্চিমে জর্জিয়া, পশ্চিমে আর্মেনিয়া এবং দক্ষিণে ইরান। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর যখন জারের সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ, তখন ১৯১৮ সালে আজারবাইজান জারের শাসন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু স্বাধীনতা বেশি দিন স্থায়ী হল না। বলশেভিক রেড আর্মি আজারবাইজান আক্রমণ করে ও দখল করে এবং ১৯২০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েতের পতনের আগেই এই দেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে (৩০ ডিসেম্বর ১৯৯১)।

সমুদ্র ও পাহাড়ে ঘেরা ছবির মতো দেশ। পূর্ব দিকে সীমানা দিয়েছে কাস্পিয়ান সাগর। উত্তর বরাবর রয়েছে গ্রেটার ককেশাস পর্বতমালা, যা হাড়কাঁপানো উত্তুরে হাওয়ার হাত থেকে দেশটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এ ছাড়া আরও দুটি পর্বতশ্রেণি লেসার ককেশাস ও তালাস দেশটার মাঝ বরাবর রয়েছে। পার্বত্য অঞ্চল গোটা দেশের মোট জমির প্রায় ৪০ শতাংশ।

আজারবাইজান নামের উৎস কী? নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন, পারস্যের আকামেনেদীয় সম্রাটরা (৫৫০ খ্রিস্টপূর্ব—৩৩০ খ্রিস্টপূর্ব) যে বিশাল সাম্রাজ্য তৈরি করেছিলেন, তার বিভিন্ন জায়গায় ছোটো ছোটো অনুগত শাসকদের বসাতেন। পারস্য সম্রাট তৃতীয় দারায়ুস ও তাঁর পতনের পর দিগ্‌বিজয়ী আলেকজান্ডারের অধীনে আতুরপাত নামে একজন শাসক এই অঞ্চল শাসন করতেন। তাঁর নাম থেকেই আজারবাইজান। অনেকে বলেন, আজারবাইজান নামটি এসেছে আজার-পায়েজান থেকে। যার অর্থ 'আগুনের রক্ষক বা আগুনের দেশ'। একসময়ে এই অঞ্চলের মানুষের ধর্ম ছিল জরথুস্ট্রীয়, যাদের প্রধান ধর্মীয় আচার ছিল আগুনের উপাসনা।

আজারবাইজানের ভূপ্রকৃতি।

খ্রিস্টের জন্মের ন-শো বছর আগে এখানে বসতি স্থাপন করে স্কিথিয়ানরা। স্কিথিয়ানদের পিছু-পিছু বাস করতে এল মেডেসরা। ৫৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ গড়ে উঠল আকামেনেদীয় সাম্রাজ্য। এই সময় জরথুস্ট্রবাদী ধর্ম সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। পরে আলেকজান্ডারের হাতে এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এর পরে রাজত্ব করেন সেলেউসিড রাজবংশ।

৬৫১ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের পারস্য বিজয়ের কিছুদিন পরেই ৬৬৭ সাল নাগাদ আজারবাইজান মুসলমানের অধীনে আসে। বর্তমানে আজারবাইজানের প্রায় ৯৮ শতাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী।

পৃথিবীর অন্যতম তেল উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে আজারবাইজান প্রসিদ্ধ। রাজধানী বাকু ও তার আশেপাশের তেলখনিগুলোর প্রাচুর্য যেকোনো দেশেরই ঈর্ষার বিষয়। যখন ১৯১৮ সালে আজারবাইজান জারের শাসন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে, নবগঠিত সোভিয়েতের প্রধান লেনিন বলেছিলেন, 'বাকুকে আমাদের দখল করতেই হবে। কারণ, সোভিয়েত রাশিয়া বাকুর তেল ছাড়া বাঁচতে পারবে না।'

আজারবাইজানের অন্যতম আকর্ষণ মাড ভলক্যানো। পৃথিবীর মোট মাড ভলক্যানোর অর্ধেকই আজারবাইজানে অবস্থিত। এই ভলক্যানো বা আগ্নেয়গিরিগুলি লাভা নিঃসরণ করে না। এদের জ্বালামুখ থেকে বেরিয়ে আসে কাদা, গ্যাস ও জল। এই আগ্নেয়গিরিগুলিকে পৃথিবীর নতুন সপ্তম আশ্চর্যের একটি ধরা হয়।

স্ক্যান্ডেনেভিয়ান অ্যান্টিসাইক্লোন, সাইবেরিয়ান অ্যান্টিসাইক্লোন, মিডল এশিয়ান অ্যান্টিসাইক্লোন আজারবাইজানের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। আজারবাইজানে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন নয়টি জলবায়ু অঞ্চল উপস্থিত। জলবায়ুর এত পার্থক্যের কারণে আজারবাইজানের জীববৈচিত্র্যও অতুলনীয়। এখানে প্রায় ১০৬ প্রকারের স্তন্যপায়ী, ৯৭ প্রকারের মাছ, ৩৬৩ প্রকারের পাখি, ১০ প্রকারের উভচর ও ৫২ প্রকারের সরীসৃপ দেখা যায়। দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চলের বিখ্যাত কারাবাক ঘোড়া আজারবাইজানের জাতীয় পশু।

আজারবাইজানের সরকারি ভাষা আজারবাইজানি। প্রায় ৯২ শতাংশ লোক এই ভাষায় কথা বলে। এ ছাড়াও এখানে প্রায় এক ডজন ভাষা প্রচলিত। আরমেনিয়ান, আভার, বুদুখ, জুহুরি, জর্জিয়ান, তাত, উদি ইত্যাদি। দেশের ৯৭.৪ শতাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী, খ্রিস্টান ১.১ শতাংশ ও অনান্য ধর্মাবলম্বী ১.৫ শতাংশ। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ৯২ শতাংশ শিয়া এবং ৮ শতাংশ সুন্নি। আজারবাইজানের সংবিধানে একে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আজারবাইজান ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ। তাই এখানকার ভূ-বিজ্ঞানীরা দিনরাত পরিশ্রম করে দেশজুড়ে প্রায় একশোটি ভূমিকম্প ভবিষ্যদ্‌বাণী কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন।

আজারবাইজানে বিভিন্ন জনজাতির মানুষ আছে। আজারবাইজানি ছাড়া এরা হলেন—আর্মেনিয়ান, রাশিয়ান, তলাশ, আভার, তুর্কি, তাতার, ইউক্রেনীয়, ইহুদি, কুর্দ ইত্যাদি।

সাংস্কৃতিক দিক থেকে পৃথিবীতে আজারবাইজানের দান অতুলনীয়। 'লায়লা-মজনু' এবং 'খসরু-শিরিনে'র মতো বিশ্ববন্দিত ট্র্যাজিক কবিতার রচনাকার নিজামি এ-দেশেরই মানুষ। দিওয়ান এবং পারসি, তুর্কি ভাষায় গজল রচনাকারী ইজ্জেদ্দিন হাসানওগলু এই মাটিরই সন্তান।

শেষ করার আগে বলি, আজারবাইজানে অতিথিকে আপ্যায়ন করার সহবত হল চা দিয়ে। এই চা যে-পাত্রে দেওয়া হয়, তা দেখতে অনেকটা নাশপাতির মতো। নাম 'আরমুদু'। আরমুদু কখনো পুরো ভর্তি করে চা দেওয়া হয় না। ওপরে এক দুই সেন্টিমিটার মতো ফাঁকা রাখা হয়। একে বলা হয় 'দোদাগ ইয়েরি' বা ঠোঁট ছোঁয়ানোর জায়গা।

অতনুমিথুন মণ্ডল

ভাষা

বো সা ন স্কি বা ব স নি য়া ন

১৯৯০ সালে যুগোস্লাভিয়া রাষ্ট্রটি নানা টানা-পোড়েনের পর ভেঙে গেলে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। সেগুলোরই একটি বসনিয়া। পুরো নাম— বসনিয়া অ্যান্ড হারজেগোভিনা। জন্মলগ্ন থেকেই ছোট্ট দেশটিতে নানা অন্তর্দ্বন্দ্ব যেমন লেগে আছে, তেমনই আছে বহির্শত্রুর শ্যেণদৃষ্টি। এমনই একটি দেশের ভাষা বসনীয়, ইংরেজিতে বসনিয়ান, ওদের নিজেদের ভাষায়— বোসানস্কি। তবে দেশটির আরও দুটি স্বীকৃত ভাষা রয়েছে— ক্রোয়েশীয় এবং সার্বীয়। ঠিক তেমনই সার্বিয়া, মন্টেনেগ্রো আর রিপাবলিক অব কসোভোতেও সীমিত এলাকায় বোসানস্কি ভাষা সরকারিভাবে স্বীকৃত। বসনিয়ার অধিবাসীদের বলা হয় বসনিয়াক। কমবেশি সাতাশ লক্ষ মানুষ এই ভাষায় কথা বলে।

বোসানস্কি ভাষার ইতিহাস কী এবং ভাষাটি কেমন?

টিকে থাকার জন্যে কোনো জাতিকে বিস্তর লড়াই করতে হলে সেই জাতির ভাষাকেও নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে যেতে হয়। বোসানস্কি বেশ প্রাচীন হলেও তেমনই একটি ভাষা।

ভাষা সম্বন্ধে জানার আগে দুটি তথ্য জানা খুবই দরকারি যে, বোসানস্কি ভাষার প্রথম বই ছাপা হয় আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে, ১৬১১ সালে। বইটির নাম 'নাউক ক্রিসৎজানস্কি জা নারোদ স্লোভিনস্কি'। লেখক মাতিজা দিভকোভিক। ছাপা হয়েছিল ভেনিসে। কয়েক বছর পর, ১৬৩১ সালে বোসানস্কি ভাষার অভিধান রচনা করেন মুহামেদ হেভাজি উসকুফি বসনেভি। এটি ছিল বসনিয়ান-তুর্কি অভিধান এবং দক্ষিণ স্লাভীয় ভাষা গোষ্ঠীর (ক্রোয়েশিয়ান, সার্বিয়ান ইত্যাদি) মধ্যে প্রাচীনতম অভিধান। রচনাকার উসকুফি ছিলেন বোসানস্কি ভাষার কবি। এটি লেখা হয়েছিল ছন্দে এবং পারসি-অ্যারাবিক বর্ণমালায়। বলা দরকার যে, গোটা বলকান অঞ্চল সে-সময় ছিল তুর্কি সাম্রাজ্যের অধীনে।

বোসানস্কি ভাষা দক্ষিণ স্লাভীয় গোষ্ঠীর একটি— এ-কথা আগেই বলেছি। ফলে এটি আদতে স্লাভ ভাষা, যেটি আবার ইন্দো-এরিয়ান ভাষা গোষ্ঠীর সদস্য।

এত পুরোনো একটি ভাষা পিছিয়ে থাকল কী করে?

অটোমান তুর্কিদের অধীনে থাকার সময় এই ভাষায় হু-হু করে আরবি, ফারসি আর তুর্কি শব্দ ঢুকে পড়ে। এমনকী এত দিনের লিপি— যাকে বলা হত বসনিয়ান সিরিলিক, অর্থাৎ সিরিলিক লিপির একটু পরিবর্তিত রূপ—

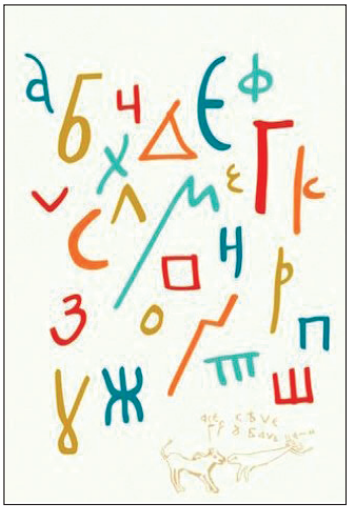

বোসানস্কি ভাষার প্রথম বই ছাপা হয় আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে, ১৬১১ সালে। বইটির নাম 'নাউক ক্রিসৎজানস্কি জা নারোদ স্লোভিনস্কি'। লেখক মাতিজা দিভকোভিক।

বসনিয়ান লিপি।

ছেড়ে তারা পারসি-অ্যারাবিক লিপিতে লেখা শুরু করে। একটু জেনে নিই, সিরিলিক লিপি কোনটি।

লাতিন লিপি ভেঙে তৈরি হয়েছিল এই লিপি। ইস্টার্ন অর্থোডক্স বিশ্বাসের স্লাভ-ভাষী মানুষেরা এই লিপি নবম-দশম শতকে ব্যবহার করতে শুরু করে। প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি ভাষার লিপি সিরিলিক। যেমন রুশ, কাজাখ, কিরঘিজ, উজবেক, বেলারুশীয়, বুলগেরিয়ান ইত্যাদি।

বোসানস্কি ভাষার লিপি কিন্তু পরে পালটে যায়। তুর্কি শাসনকালে লিপি হয়ে যায় পারসি-অ্যারাবিক। এবং প্রচুর পরিমাণে আরবি-ফারসি-তুর্কি শব্দ এই সময়েই ঢুকে পড়ে। উনিশ শতক পর্যন্ত আজকের ক্রোয়েশিয়া, সার্বিয়া-সহ গোটা এলাকায় বোসানস্কি ভাষার প্রাধান্য ছিল অব্যাহত। কিন্তু সেই তুর্কি সাম্রাজ্যে অভিজাত বসনিয়াকরা কথা বলত আর লেখাপড়া করত আরবি, ফারসি, তুর্কি ভাষায়। মাতৃভাষা বোসানস্কিকে অবহেলা করত। পরে যখন যুগোস্লাভিয়া রাষ্ট্র গঠিত হল তুর্কি আর অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য ভেঙে, তখন বসনিয়াকদের আগের অবহেলাই বোসানস্কি ভাষাকে পেছনে ফেলে দেয়। এগিয়ে আসে সার্বো-ক্রোয়েশীয় ভাষা। 'সার্বো-ক্রোয়েশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ' কথাটি কিন্তু খুব পুরোনো নয়। ১৮২৪ সালে জার্মান অভিধান রচয়িতা এবং বিখ্যাত রূপকথা-লেখক জ্যাকব লুডউইগ গ্রিম (বিখ্যাত গ্রিমভাইদের বড়ো যিনি। আমরা বাংলা অনুবাদে 'গ্রিমভাইদের রূপকথা' পড়েছি।) এই নামটি দেন। সার্বো-ক্রোয়েশীয় ভাষার তিনটি শাখা— কাজকাভিয়ান, চাকাভিয়ান এবং স্তোকাভিয়ান। সার্বিয়া, মন্টেনেগ্রো, বসনিয়া, হারজেগোভিনায় সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার হয় স্তোকাভিয়ান। ক্রোয়েশিয়ায় ব্যবহার হয় তিনটিই শাখা। সমুদ্র-উপকূল অঞ্চলে চাকাভিয়ান এবং রাজধানী জাগ্রেব-সহ আশপাশে কাজকাভিয়ান ব্যবহার হলেও দেশটির ভেতর-অঞ্চলে চলে স্তোকাভিয়ান। ফলে দেখা যাচ্ছে, বসনিয়াকদের ভাষাই আজও সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা, যেটি স্তোকাভিয়ান। তুর্কি-অনুষঙ্গে ভাষাটির বিশ্বজনীন স্বীকৃতি পেতে লেগে গেল ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত।

এখন বোসানস্কি বা বসনিয়ান ভাষা লেখা হয় লাতিন লিপিতে।

এবার দেখি বোসানস্কির দু-একটা নমুনা শব্দ।

আমি: জা (Ja), তুমি: ভাস (Vas), মা: মাজকা (Majka), বাবা: ওতাস (Otac)।

তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? : sta klase citas u ?

এখন স্কুলে যাব: Sada idem u skolu।

নেহা চৌধুরী

তারায় তারায়

লু ব্ধ ক

আমাদের খুব চেনাজানা নক্ষত্রমণ্ডলীর একটি কালপুরুষ। শীতের মেঘহীন আকাশে সবার আগে চোখে পড়ে। প্রাচীন সময় থেকেই এই তারামণ্ডলীকে কল্পনা করা হয় একজন যোদ্ধা হিসেবে। যোদ্ধা মানুষটার এক হাতে রয়েছে ধনুক, অন্য হাতে তির, কটিবন্ধে ঝুলছে তরোয়াল। এই কটিবন্ধ বা বেল্টটি কল্পনা করা হয়েছে তিনটি তারাকে জুড়ে। এখন যদি এই তিন তারা জুড়ে পাওয়া সরলরেখাটিকে কল্পনায় দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়, তাহলে দেখতে পাব আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা সিরিয়াস বা লুব্ধককে।

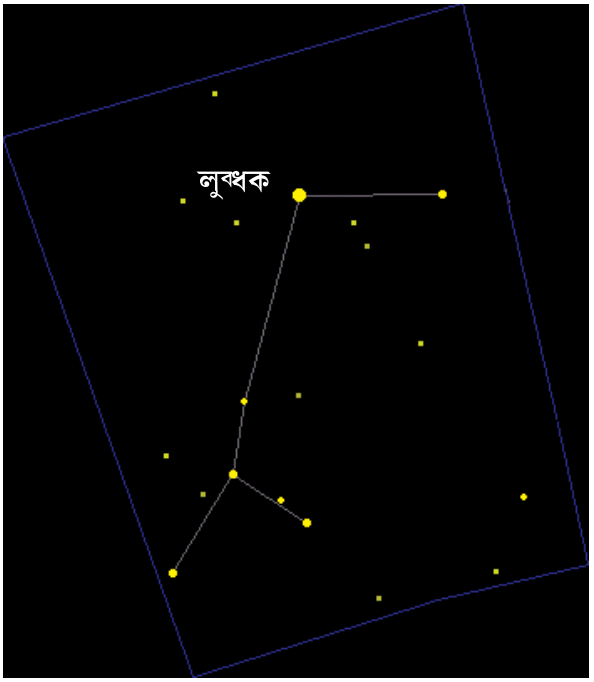

লুব্ধকের প্রভার মান ১.৪৬। এটি আমাদের সৌরজগতের অন্যতম প্রতিবেশী। দূরত্ব মাত্র ৮.৬ আলোকবর্ষ। যখন লুব্ধক দিগন্তের কাছাকাছি থাকে, মনে হয় যেন বার বার রং বদলাচ্ছে। কখনো রং উজ্জ্বল নীল, কখনো লাল বা সবুজ— আসলে এটি হয় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দ্বারা প্রতিসরণের জন্যে। লুব্ধকের অসামান্য ঔজ্জ্বল্যের কারণে একে দিনের বেলাও আকাশে কখনো কখনো দেখা যায়।

যদিও লুব্ধককে একটিই তারা মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে এটি একটি বাইনারি স্টার সিস্টেম। অর্থাৎ দুটি তারা, যারা পরস্পরকে নিজেদের ভরকেন্দ্রে রেখে একে অন্যের চারিদিকে ঘুরতে থাকে। ঠিক যেন মানিকজোড়। যে দুটি তারা নিয়ে এই স্টার সিস্টেম গঠিত, তারা হল সিরিয়াস এ (Sirius A) এবং সিরিয়াস বি (Sirius B)। সিরিয়াস এ-র আয়তন সূর্যের প্রায় দ্বিগুণ এবং এর উজ্জ্বলতা সূর্যের ২৫ গুণ। উষ্ণতা ১০ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা সূর্যের উষ্ণতার দ্বিগুণ। এটি একটি সাদা মেন সিকোয়েন্স তারা, যা প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ বিলিয়ন বছর আগে তৈরি হয়েছে। সিরিয়াস বি নক্ষত্রটি প্রাথমিক অবস্থায় সিরিয়াস এ-র থেকে আকারে অনেক বড়ো ছিল। কিন্তু আকারে বড়ো হওয়ার জন্যে খুব দ্রুত নিজের সমস্ত জ্বালানি নিঃশেষ করে লাল দানবে পরিণত হয়। বর্তমানে এটি শ্বেত বামন পর্যায়ে রয়েছে। এই পর্যায়ে সিরিয়াস বি পৌঁছেছিল ১২০ মিলিয়ন বছর আগে। সিরিয়াস বি আকারে পৃথিবীর মতো হলেও এর উষ্ণতা সূর্যের পাঁচ গুণ।

লুব্ধক ক্রমে আমাদের সৌরজগতের কাছে সরে আসছে। তাই আগামী ৬০ হাজার বছর ধরে এর উজ্জ্বলতা ক্রমশ বাড়বে। আবার এর পরে দূরত্ব বাড়তে থাকলে উজ্জ্বলতা কমবে। আগামী ২১ লক্ষ বছর পর্যন্ত এটিই থাকবে আকাশের উজ্জ্বলতম তারা হয়ে।

প্রাচীন কাল থেকেই লুব্ধকের সঙ্গে কুকুরের অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে। লুব্ধককে বলা হয় 'ডগ স্টার' বা কুকুর তারা। দিগন্তে কালপুরুষের উদয়ের কিছুক্ষণ পর লুব্ধকের দেখা মেলে। তাই প্রাচীন সময় থেকে মানুষ লুব্ধককে ভেবে এসেছে যোদ্ধা কালপুরুষের শিকারি কুকুর হিসেবে। প্রাচীন গ্রিসের লোকেরা বলত, লুব্ধকের উদয়ের ফলে শুরু হয় 'ডগ ডেজ অব সামার' বা গ্রীষ্মের দাবদাহের দিন। সিরিয়াস নামটিই এসেছে গ্রিক শব্দ 'সেইরিওস' (Seirios) থেকে। যার অর্থ— বিকিরণ বা ঝলসে যাওয়া। গ্রিসের মানুষের বিশ্বাস ছিল, কুকুরেরা পাগল হয়ে ওঠে 'ডগ ডেজে'র সময়কার প্রচণ্ড গরমে। এবং এর জন্যে লুব্ধকই দায়ী। ইজিয়ান সমুদ্রের তীরে সিওস দ্বীপের মানুষরা সিরিয়াস ও দেবরাজ জিউসের উদ্দেশে বলির ব্যবস্থা করত, যাতে ঠান্ডা বাতাসের দেখা মেলে। রোমানরা সিরিয়াসের উদ্দেশে একটি কুকুর ও দেবী রোবিসোর উদ্দেশে একটি ভেড়া উৎসর্গ করত, যাতে না সেই বছরকার চাষ হওয়া গমে ধোসা রোগ দেখা দেয়। 'ডগ ডেজ'কে রোমানরা বলত 'Dies caniculares'এবং সিরিয়াসকে বলত 'Canicula'— ছোটো কুকুর।

সংস্কৃতে লুব্ধকের আর-এক নাম মৃগব্যাধ। মৃগব্যাধ তারাটিকে শিবের এক রূপ ধরা হয়। মালয়ালাম ভাষায় এর নাম মকরজ্যোতি। পারস্য-দেশীয় পুরাণে জরথুস্ট্রবাদীদের মধ্যে লুব্ধক পরিচিত ছিল 'তিস্ট্র' নামে। জেন্দ আবেস্তায় পাওয়া যায় তিস্ট্র হল বৃষ্টি ও উর্বরতার দেবতা এবং তার প্রধান শত্রু হল 'আপোসা'। যিনি খরার দানব। ফেরদৌসির 'শাহনামা' মহাকাব্যে লুব্ধকের উল্লেখ আছে 'তির' নামে। চীনা জ্যোতির্বিজ্ঞানে লুব্ধককে বলা হয় 'তিয়ানলাঙ', যার অর্থ— স্বর্গের নেকড়ে। নেব্রাস্কার পাওনি উপজাতিরা একে বলে নেকড়ে তারা। কোরআনেও লুব্ধকের উল্লেখ আছে। সুরা আন-নাজমে এই তারাটিকে বলা হয়েছে 'আশ-শেরা', দিন-দুনিয়ার মালিক আল্লাহ্ এই তারাকে তার পথে চালিত করেন। বিখ্যাত ইসলামি পণ্ডিত ইসমাইল ইবন কাতহির বলেছেন, আরব জাতির কাছে এই তারা পরিচিত ছিল 'মিরজাম-আল-জায়জা' নামে। প্রাক্-ইসলামি আরবদের মধ্যে এই তারাকে উপাসনার রীতি চালু ছিল।

প্রাচীন মিশরে লুব্ধককে 'সপডেট' নামে ডাকা হত। আকাশে টানা সত্তর দিন অনুপস্থিত থাকার পর গোধূলির আকাশে লুব্ধকের উদয় হত। এই সময়ই নীল নদে বন্যা হত বলে, মনে করা হত লুব্ধকের উদয়ের সঙ্গে বন্যার সম্পর্ক আছে। লুব্ধকের এই উদয়ের দিনটি থেকে প্রাচীন মিশরে বর্ষগণনা শুরু হত। হায়ারোগ্লিফ লিপিতে সপডেটকে একটি ত্রিভুজ ও তারার মাধ্যমে দেখানো হত। একটি বাহু দেবী আইসিস, অন্যদুটি তাঁর স্বামী ওসিরিস ও পুত্র হোরাসকে সূচিত করত। আকাশে টানা সত্তর দিন অনুপস্থিতির সময় মিশরবাসীরা মনে করত আইসিস ও ওসিরিস পাতাল বা দুয়াতে প্রবেশ করেছেন।

পশ্চিম আফ্রিকার ডজন উপজাতির মানুষরা মনে করে সিরিয়াসের চারপাশে একটি লাল রশ্মির বলয় আছে। এই উপজাতিটি বিগত পাঁচ হাজার বছর ধরে লুব্ধকের উপাসনা করে আসছে। ওরা কিন্তু পাঁচ হাজার বছর আগে থেকেই জানত লুব্ধক দুটি তারার সমষ্টি। যা এদের রচিত গাথা থেকে জানা যায়। এদের বিশ্বাস পাঁচ হাজার বছর আগে নোম্মো নামের দেবতারা তিন পাওয়ালা মহাকাশযানে চড়ে পৃথিবীতে বসতি স্থাপন করেছিল। লুব্ধক হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অক্ষ এবং এর ঘূর্ণনের ফলে বস্তু ও আত্মা তৈরি হয়েছে।

অতনুমিথুন মণ্ডল

বইভব

দেশে বিদেশে, সৈয়দ মুজতবা আলী,
নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা।

র ম্য তা ও বু দ্ধি র দী প্তি তে উ জ্জ্ব ল

'দেশে বিদেশে' নিয়ে আলোচনার প্রথমেই মনে পড়ছে শেখ আহমদ আলীর সারগর্ভ কথা, যাঁর কাছে সৈয়দ মুজতবা আলী পেশোয়ারে আতিথ্য লাভ করেছিলেন। সেই আতিথ্য যেমন অকৃত্রিম, তেমনি মাত্রাহীন। আহমদ আলী লেখককে বলেছিলেন, 'হাসি কি আর গল্পে ঠাসা থাকে, হাসি থাকে খুশ-দিলে।' সৈয়দ মুজতবা আলীর বৈঠকি চালের আসর জমানো গল্প-কথন আর্টেরও মূল উৎস সেই খুশ-দিল। অন্তরের সহজাত সরসতা। তিনি প্রকৃত অর্থেই কথাশিল্পী। মুখের কথার রম্যতা অনায়াসে ঝরে পড়ে লেখায়। লিখনভঙ্গিমা স্বতঃস্ফূর্ত ও বর্ণময়। গুরু ও চণ্ডালকে বসিয়ে দেন এক পঙ্‌ক্তিতে। শান্তিনিকেতনের জলবাতাস, রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য, দেশ-বিদেশের বিচিত্র মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক, বহু অধ্যয়ন মুজতবা আলীর মনকে করেছে সমৃদ্ধ এবং রসসিক্ত। চারপাশকে দেখেছেন অনন্য পর্যবেক্ষণ শক্তিতে। তাঁর আসরে প্রাজ্ঞ থেকে সাধারণ সব শ্রেণির চরিত্রই বর্ণনার স্টাইলে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। অফুরন্ত আলী সাহেবের উইট। উপমা, উৎপ্রেক্ষাসমূহের কী আশ্চর্য প্রয়োগ। তাঁর রচনারীতির পূর্বসূরি অংশত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরীরা। আর উত্তরসূরি খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। 'দেশে বিদেশে'র প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে সুবিস্তৃত রেফারেন্স। ভাষাতত্ত্ব থেকে ইতিহাস, রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব, মিথ, সমাজবিজ্ঞান কী নেই সেখানে। সঙ্গে অভিজ্ঞতার অন্তহীন ভাণ্ডার। কিন্তু কোথাও পাণ্ডিত্যের দেখানেপনা নেই। মজলিশি ঢং এতটুকু ভারাক্রান্ত হচ্ছে না বিদ্যার গৌরবে। পরিবেশনের জাদুতে দুরূহ বিষয় সুস্মিত হয়ে ওঠে।

আমানুল্লাহ খান তখন আফগানিস্তানের সম্রাট। তিনি দেশের শিক্ষা সংস্কারে মনোযোগী হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে ফরাসি অধ্যাপক বেনোয়া, রাশিয়ান অধ্যাপক বগদানফ কাবুলের শিক্ষাবিভাগে যোগ দিলেন। তাঁদের আহ্বানে কাবুল গেলেন মুজতবা আলী। ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত কাবুলে অধ্যাপনা করেন। 'দেশে বিদেশে' গ্রন্থের বিয়াল্লিশটি অধ্যায়ে রয়েছে হাওড়া থেকে পেশোয়ার, খাইবার পাশ, জলালাবাদ, নিমলা হয়ে কাবুলে পৌঁছোনোর অভিজ্ঞতা, কাবুলে দু-বছর বসবাসের স্মৃতি, বাচ্চাই সাকো কাবুলের বাদশাহ হওয়ার পর কাবুলের ভয়াবহ অবস্থা এবং রাহুকবলিত কাবুল ত্যাগ করে লেখকের দেশে ফিরে আসার এমন এক বিবরণ, যা পড়তে পড়তে কখন যেন ট্রেনের সহযাত্রী ফিরিঙ্গি ভদ্রলোক ও সর্দারজি, আহমদ আলী, বেতার সাহেব, ড্রাইভার অমর সিং বুলানী, মৌলানা জিয়াউদ্দিন, পরিচারক আবদুর রহমান আমাদের আত্মজন হয়ে ওঠেন। ১৯৪৮ সালে ধারাবাহিকভাবে 'দেশে' প্রকাশিত হয় 'দেশে বিদেশে', ১৯৪৯-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশ। এবং বিপুল জনপ্রিয়তা পায়।

'দেশে বিদেশে' গ্রন্থের এপিসোডগুলির এমনই মাধুর্য, উল্লেখ করার সময় কোনো প্রসঙ্গই বাদ দিতে ইচ্ছে করে না। লেখক সহযাত্রী সর্দারজিকে প্রশ্ন করেছিলেন শিলওয়ার বানাতে ক-গজ কাপড় লাগে? উত্তর এল— 'দিল্লিতে সাড়ে তিন, জলন্ধরে সাড়ে চার, লাহোরে সাড়ে পাঁচ, লালামুসায় সাড়ে ছয়, রাওলপিন্ডিতে সাড়ে সাত, তারপর পেশওয়ারে এক লম্ফে সাড়ে দশ, খাস পাঠানমুল্লুক কোহাট খাইবারে পুরো থান।'

'বিশ গজ!'

'হ্যাঁ, তাও আবার খাকী শার্টিঙ দিয়ে বানানো।'

এই বিশগজি শিলওয়ার নাকি নবীন পাঠান বিয়ের দিন শ্বশুরের কাছ থেকে পায়, মরার সময় ছেলেকে দিয়ে যায়। ছেলে আবার বিয়ের সময় নতুন শিলওয়ার পায়, ততদিন বাপেরটা দিয়েই চালায়। এমন হাস্যোজ্জ্বল অতিরেকের পাশাপাশি করুণ মর্মস্পর্শী ঘটনার কথাও বলেছেন লেখক। এই ঘটনার কথক বেতার সাহেব, কাবুল বেতারকেন্দ্রের কর্মচারী। তিরিশ বছর আগে নিমলার বাগান থেকে একজন কয়েদি পালিয়েছিল। পাহারাওয়ালারা এক নির্দোষ লোককে ধরে কয়েদির সংখ্যা পূরণ করে। বিষয়টি পুরো ধামাচাপা দেওয়ার জন্য ধরে আনা লোকটিকে ভীষণ ভয় দেখিয়ে বলা হয় জলালাবাদ জেলখানার জেলারের সামনে আত্মপরিচয়ের সময় সে যেন শুধু বলে— 'মা খু চিহ্‌ল্ ও পঞ্জুম্ হস্তম্' অর্থাৎ আমি পঁয়তাল্লিশ নম্বরের। এভাবে ষোলো বছর কাটে। তারপর তামাম আফগানিস্তানে এক খুশির উৎসব শুরু হয়। আমির হবিব উল্লা ঠিক কী করবেন— কয়েদিদের মেয়াদ কমিয়ে দেবেন না মুক্তি দেবেন। সেই লোকটির যখন পরিচয় বাদশা জানতে চাইলেন, তখন সে শুধু একটিই কথা বলে— আমি পঁয়তাল্লিশ নম্বরের। অন্য বিষয়ে তার বুদ্ধি ঠিকঠাক কাজ করছে কিন্তু 'ষোল বছর ঐ মন্ত্র জপ করে করে তার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছে, তার নাম নেই ধাম নেই, সাকিন ঠিকানা নেই, তার পাপ নেই পুণ্য নেই, জেলের ভেতরের বন্ধন নেই, বাইরের মুক্তিও নেই— তার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব তার সর্বৈব সত্তা ঐ এক মন্ত্রে, আমি পঁয়তাল্লিশ নম্বরের।'

বহুভাষাবিদ সৈয়দ মুজতবা আলী দেশি বিদেশি শব্দভাণ্ডার থেকে নানা শব্দ চয়ন করে বাংলা সাহিত্যে তাদের বিশিষ্ট আসন দিয়েছিলেন। ক্রিয়াপদের ব্যবহারে তাঁর হাত ধরে এসেছে অনেক অভিনবত্ব। বাক্‌রীতির পুনর্নির্মাণে গভীর কৌতূহল ছিল তাঁর। অজস্র উদাহরণ থেকে দু-একটি উল্লেখ করা হল। আফগান সরাইখানার অপরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে লিখলেন— 'সূচীভেদ্য অন্ধকার দেখেছি, এই প্রথম সূচীভেদ্য দুর্গন্ধ শুঁকলুম।' কাবুল ত্যাগের সময় মালপত্রের ওজন সম্পর্কে তাঁর সরস মন্তব্য— 'ওজন তিন লাশ।' আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক শব্দের মিশেলে 'দেশে বিদেশে' মনোরম হয়ে উঠেছে এবং বাংলা শব্দভাণ্ডারও সম্প্রসারিত হয়েছে।

'পঞ্চতন্ত্র', 'চাচাকাহিনি'তেও সৈয়দ মুজতবা আলী হাস্যরসের সঙ্গে মননকে একসূত্রে গেঁথেছেন। রম্যতা, লঘুচালের ভেতর বুদ্ধির দীপ্তি, শ্লেষ, সংবেদী মনের স্নিগ্ধতা তাঁর সাহিত্যকে কালজয়ী করেছে। তবু 'দেশে বিদেশে'তে এমন একটা বাজিমাত করলেন যে, এ-বই অনেক বার পড়ার পরও নতুন করে পড়তে শুরু করলে শেষ না করে কিছুতেই শান্তি পাওয়া যায় না। 'দেশে বিদেশে' একাধারে ধ্রুপদি ও রোমাঞ্চকর। কাবুল থেকে বিদায়ের মহূর্তে আলী সাহেবের চাকর আবদুর রহমান মন্ত্রোচ্চারণের মতো বলে চলেছেন— 'ব্ খুদা সপুর্দমৎ, সাহেব, ব্ খুদা সপুর্দমৎ, সাহেব।' 'তোমাকে খোদার হাতে সোপর্দ করলুম।' প্লেন চলতে আরম্ভ করেছে। বাতাসে ভাসছে শব্দতরঙ্গ 'সপুর্দমৎ'। বিশাল বপু, অসম্ভব সাধনে সমর্থ বরফের দেশ পানশিরের লোক আবদুর রহমানের হৃদয় কুসুমের মতো কোমল। 'দেশে বিদেশে'র শেষ পঙ্‌ক্তি মানব-সম্পর্কের চির আকাঙ্ক্ষিত রূপটি উন্মোচিত করে। 'চতুর্দিকের বরফের চেয়ে শুভ্রতর আবদুর রহমানের পাগড়ি, আর শুভ্রতম আবদুর রহমানের হৃদয়।' গভীর এক সত্যের প্রতিধ্বনি অনুরণিত হয় পাঠকের মনে।

দেবজ্যোতি রায়

সবজান্তা

মে কথা

জুলিয়েন এবং গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এটি বছরের পঞ্চম মাস। গ্রিকদের উর্বরাশক্তির দেবী মায়া (Maia) পরে রোমানদেরও দেবী ছিলেন। তাঁরই নামে মাসটির নামকরণ হয়েছে।

রোমান কবি ওভিদ অবশ্য আর-একটি মত দিয়েছেন। বলেছেন, লাতিন মায়োরেস (Maiores) থেকে এসেছে শব্দটি, যার অর্থ বড়ো। আর তারই অনুসরণে পরের মাসটির নাম জুনিওরেস (Juniores) থেকে (অর্থ— তরুণ দল) জুন।

১মে: দিনটি মে দিবস নামে খ্যাত। বিশ্বের প্রায় আশিটি দেশে পয়লা মে জাতীয় ছুটির দিন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজের বদলে দিনে আট ঘণ্টা কাজ ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকরা দাবি জানাতে থাকে ১৮৬০ সাল থেকে। সেই দাবি ক্রমে আন্দোলনের রূপ নেয় এবং ১৮৮৪ সালে শ্রমিক সংগঠনগুলো এই মর্মে একটি প্রস্তাব পাস করে। তারা প্রস্তাবটি কার্যকর করার জন্য একটি সময়সীমা বেঁধে দেয়। সেটি ১৮৮৬ সালের পয়লা মে। মালিকপক্ষ কার্যকর না করায় ওই দিন থেকে শুরু হয় জোর আন্দোলন, ধর্মঘট। ৩ মে (কারও মতে ৪ মে) শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিকরা জমায়েত হলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ হারান বেশ কিছু শ্রমিক। শ্রমিকনেতা অগাস্ট ব্লিজ-সহ বেশ কয়েক জনকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁদের মধ্যে ফাঁসিও হয় নেতা-সহ কয়েক জনের। অগাস্ট ব্লিজ ফাঁসির মঞ্চে চিৎকার করে বলে ওঠেন— আমাদের আজকের নীরবতা আগামী দিনে তোমাদের সোচ্চার হওয়ার চেয়েও অনেক শক্তিশালী।

জুন কথা

যাকে চলতি বাংলায় আমরা ইংরেজি বছর বলি, আসলে যা জুলিয়েন আর গ্রেগরিয়ান মতের ক্যালেন্ডার। জুন হচ্ছে সেই ক্যালেন্ডারের ষষ্ঠ মাস। শব্দটির উৎস সম্বন্ধে একাধিক মত আছে। তাদের একটি এরকম: রোমান দেবতা জুপিটারের স্ত্রী এবং উর্বরাশক্তির দেবী জুনোর নামে এই মাসের নাম। আবার মহাকবি ওভিদ বলেছেন, লাতিন জুনিওরেস (Juniores) থেকে শব্দটি এসেছে। মাসটিকে বিবাহের পক্ষে শুভ বলে মনে করত রোমানরা। এটি তিরিশ দিনের মাস। উত্তর গোলার্ধে এ-সময় গ্রীষ্মকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে শীত।

নিরো ক্লডিয়াস সিজার অগাস্টাস জার্মানিকাস।

৯ জুন ৬৮ খ্রিস্টাব্দ: রোম যখন পুড়ছে, সম্রাট নিরো তখন প্রাসাদকক্ষে বেহালা বাজাচ্ছেন— এমন একটা কথা আমরা শুনেছি। এই ঘটনার জন্যে তিনি আজও কুখ্যাত হয়ে আছেন। কিন্তু অনেকেই আমরা জানি না, এই দিনটিতে নিরো আত্মহত্যায় মৃত্যুবরণ করেন। পুরো নাম ছিল— নিরো ক্লডিয়াস সিজার অগাস্টাস জার্মানিকাস। বলা হয়, তাঁরই আমলে রোমে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য দুই সন্ত পল এবং পিটারের মৃত্যুদণ্ড হয়। অতিরিক্ত কর বসানোর জন্য প্রজাবিদ্রোহে রাজ্যে চরম অশান্তি লাগলে নিরো শেষপর্যন্ত একা হয়ে যান। এমনই একা যে, বিশাল নির্জন প্রাসাদে কাউকে ডেকেও তিনি যখন পাচ্ছেন না, মাত্র চারজন সঙ্গী নিয়ে এক অনুগত ভৃত্যের বাড়িতে চলে যান। সেখানেই মণিবন্ধ কেটে আত্মহত্যা করার আগে শেষ অনুগামীদের বলেন কবর খুঁড়তে। নিরোই ছিলেন জুলিও-ক্লডিয়ান বংশের শেষ সম্রাট।

জুলাই কথা

এই সপ্তম মাসটির নামকরণ হয়েছে বিখ্যাত রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের নামানুসারে। এই মাসেই তাঁর জন্ম হওয়ায় রোমান সেনেট এমন সিদ্ধান্তটি নেয়। এ-মাসে উত্তর গোলার্ধে চরম গ্রীষ্ম এবং দক্ষিণ গোলার্ধে প্রচণ্ড শীত।

৫ জুলাই। ১৬৮৭: এই দিনে স্যার আইজাক নিউটন প্রকাশ করেন তাঁর যুগান্তকারী গবেষণা— ফিলসফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা বা ম্যাথমেটিক্যাল প্রিন্সিপল অব ন্যাচারাল ফিলসফি, সংক্ষেপে যা 'প্রিন্সিপিয়া' নামে বিখ্যাত। ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, 'উই অফার দিস ওয়ার্ক অ্যাজ ম্যাথমেটিক্যাল প্রিন্সিপলস অব ফিলসফি। ফর অল দি ডিফিকাল্টি অব ফিলসফি সিমস টু কনসিস্ট ইন দিস— ফ্রম দি ফেনোমেনা অব মোশনস টু ইনভেস্টিগেট দি ফোর্সেস অব নেচার, অ্যান্ড দেন ফ্রম দিজ ফোর্সেস টু ডেমোনেস্ট্রেট দি আদার ফেনোমেনা।'

সর্বজনীন মহাকর্ষ এবং গতির তিনটি সূত্র এই গবেষণাকর্মেই বিধৃত হয়েছে। এই সূত্র এবং মৌল নীতিগুলোই কাজ করেছে চিরায়ত বলবিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে।

অগাস্ট কথা

এই অষ্টম মাসটি ৩১ দিনের। মাসটির নাম আগে ছিল লাতিন সেক্সটিলিস (Sextilis), কেননা, যখন বছর ছিল দশ মাসের, তখন এটি ছিল ষষ্ঠ মাস। পরে জুলিয়াস সিজারের সময় জুলিয়েন ক্যালেন্ডার তৈরি হলে আরও দুটো মাস ঢুকে বছর হয় বারো মাসের। পরে রোমান সম্রাট অগাস্টাসের (জন্ম ৩১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ— মৃত্যু ১৯ অগাস্ট ১৪ খ্রিস্টাব্দ) নামে মাসটি হয় অগাস্ট। এবং হয়ে যায় অষ্টম মাস।

হারমান মেলভিল।

১ অগাস্ট ১৮১৯: নিউইয়র্ক শহরে এই দিনটিতে জন্ম আমেরিকান নবজাগরণের এক লেখকের। নাম হারমান মেলভিল। দশটি উপন্যাস এবং বেশ কয়েকটি ছোটোগল্প লিখলেও মেলভিলের দুনিয়া জোড়া খ্যাতি 'মবি ডিক' উপন্যাসের জন্য। এক সাধারণ নাবিকের চাকরি নিয়ে সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরেছেন আর সেই অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন একাধিক উপন্যাস। 'মবি ডিক' এক সাদা হাঙরকে নিয়ে লেখা আশ্চর্য উপন্যাস। তবু বলতেই হয়, হারমান মেলভিলের বই তেমন বিক্রি হয়নি। সেদিক থেকে অসফল লেখকই বলা যায় তাঁকে। এমনকী জীবনের শেষ তিরিশ বছর মানুষ ভুলেই গিয়েছিল তাঁকে। পরে তাঁর লেখা নিয়ে মানুষের আগ্রহ বাড়ে। ১৮৯১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ৭১ বছর বয়সে হারমান মেলভিল প্রয়াত হন নিউইয়র্ক শহরেই। ■

লেখাপড়ার ফাঁকে ছোটোদের কল্পনা ডানা মেলে পাড়ি দেয় রূপ ও কথার দেশে।
দিগন্তের নীল আর পরির পালক দিয়ে সেখানে তারা রচনা করে স্বপ্নের জগৎ।
কাঁচা মনের সেইসব রং দিয়ে সাজানো এই পাতা।

নাজমা ইয়াসমিন। পঞ্চম শ্রেণি। পাথরচাপুড়ি ক্যাম্পাস।

ভাবনা

সেখ রাজিব-উল-ইসলাম
অষ্টম শ্রেণি, বাবনান ক্যাম্পাস

লাল বনটার চারিদিকে সারি সারি বুনো লতা,
সবুজ প্রান্তরে ঘেরা দিঘি, মনের মাঝিটা একা।
লাল-নীল আকাশ হঠাৎ দেখা যায়,
মনে হয় শঙ্খচিলেরা উড়িয়ে নিয়ে যায়।
আকাশগঙ্গা, ছায়াপথ সব যায় মুছে,
মনে পড়ে অতীত দিনের কবিতা ফের।

আমার মা

মনিকা খাতুন
পঞ্চম শ্রেণি, বাবনান ক্যাম্পাস

তোমরা তো কেউ চেন নাকো আমার মিষ্টি মাকে।
নরম সবুজ পাতায় ঘেরা ফুলের বনে থাকে।
জ্যোৎস্নামাখা রাত্রি নিঝুম ঠান্ডা মধুর হাওয়া
বইলে ভাবি— এই তো সময় মায়ের কাছে যাওয়ার।

মিশনের বাইরে মাঠের দৃশ্য

মহ. ওমর ফারুক জমাদার
অষ্টম শ্রেণি, বাবনান ক্যাম্পাস

ওই যে দূরে আলুর খেত বিশাল মাঠ জুড়ে,
শ্রমিকরা সব তুলছে আলু মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে।
মাঠের পাশে পুকুরেতে মাছেরা খেলা করে,
সেই সুযোগে জেলেরা সব জাল নিয়ে মাছ ধরে।
মাঠের পরে হাইরোডেতে ব্যস্ত গাড়ি চলে,
রাতের বেলা ল্যাম্পপোস্টে হলুদ আলো জ্বলে।
মাঠের পাশে আমি থাকি আল-আমীনের শাখায়,
মিশন থেকে মাঠগুলিকে খুব সুন্দর দেখায়।

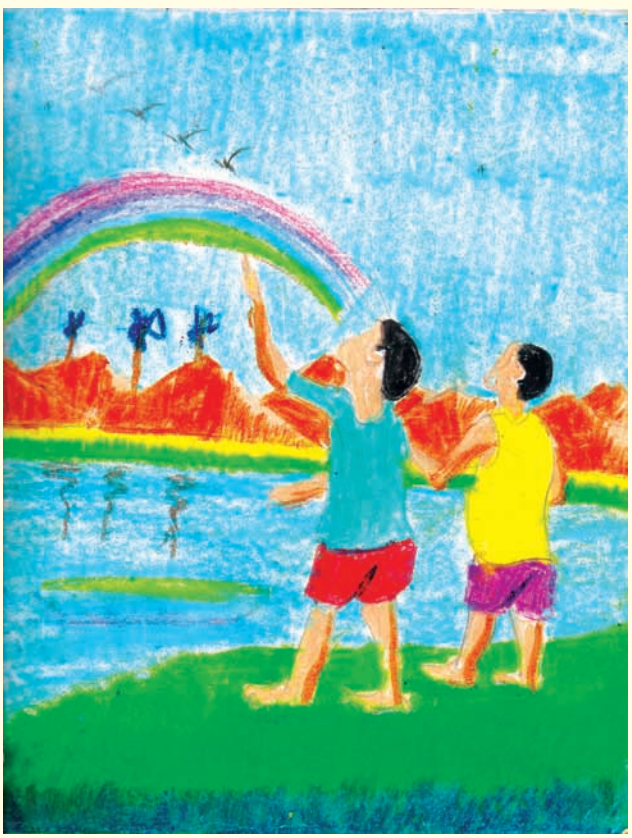

সেখ আকাশ। ষষ্ঠ শ্রেণি। জীবনপুর ক্যাম্পাস।

তিন পাহাড়ের দেশ

ইরফান মণ্ডল
সপ্তম শ্রেণি, বাবনান ক্যাম্পাস

কবীরের অনেক ইচ্ছা পাহাড় দেখার। কিন্তু তার বাবা-মা তাকে পড়াশোনা ছাড়া আর-কিছুই করতে দিতেন না। সে কখনো ভালোভাবে ঘুরতে যেতে পারেনি। কবীরের এক বন্ধু ছিল, তার নাম রাম। সে তার সব দুঃখ রামের কাছে প্রকাশ করত। এক দিন কবীর হঠাৎ ভাবল কাল পাহাড় দেখতে নিশ্চয় যাবে। এই বলে সে ঘুমিয়ে পড়ল এবং সে একটি স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নটি ছিল পাহাড় নিয়ে। কবীর স্বপ্নে দেখল যে, সে একটি অজানা জায়গায় এসে পৌঁছোল। সে ভয় পেয়ে কাঁদতে লাগল, এবং বলল, 'আমি কোথায় এসে গিয়েছি? এই জায়গাটা কোন দেশে? আমার মা-বাবা কোথায়?' আর কোনো প্রশ্ন না করে কবীর হাঁটতে লাগল। প্রায় আধ ঘণ্টা হেঁটে পথ চলার পর সে একটি পাহাড় দেখতে পেল। প্রথম বার পাহাড় দেখতে পাওয়ার জন্যে তার মন খুশিতে ভরে উঠল। সে না দাঁড়িয়ে পাহাড়ে চড়তে লাগল। সে কিছুটা পথ যাবার পর হাঁপিয়ে গেল এবং একটি বড়ো ঢিপির ওপর বসে পড়ল।

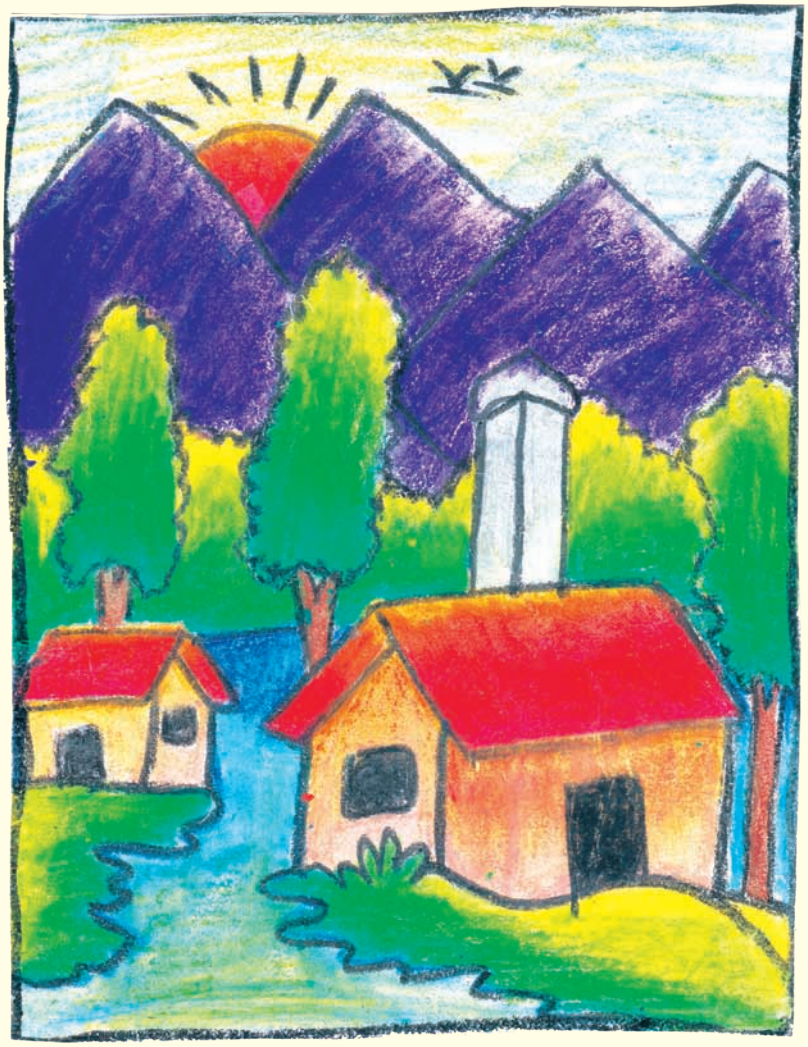

সুফিয়া সর্দার। পঞ্চম শ্রেণি। বাবনান ক্যাম্পাস।

প্রায় পনেরো মিনিট বসে থাকার পর সে দাঁড়িয়ে আবার পাহাড়ে উঠতে লাগল। কবীর পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে, সবকিছু সোনার তৈরি, যেমন— গাছপালা, পাথর ইত্যাদি— দেখতে পেল, এবং তার মন খুশিতে ভরে গেল। কবীর সোনার পাহাড়ের মাথা থেকে কিছু সোনার মুদ্রা নিয়ে, পাহাড়ের পিছন থেকে নেমে এল। তারপর আবার সে কুড়ি মিনিট হেঁটে গিয়ে একটি চাঁদির পাহাড় দেখতে পেল এবং সে চাঁদির পাহাড়টিতে চড়তে লাগল। কবীর তার চারপাশ দেখে বলল, 'বাঃ! খুব সুন্দর তো পাহাড়টি।' সে পাহাড়ের মাথায় উঠে আশ্চর্য হয়ে গেল। তারপর সে কিছু চাঁদির মুদ্রা তার ঝোলায় ভরে নিয়ে নীচে নেমে এল। কবীর আবার হেঁটে পথ চলতে লাগল। প্রায় দশ মিনিট হেঁটে যাওয়ার পর সে একটি খুব সুন্দর পাহাড় দেখতে পেল। কবীর সেই পাহাড়ে উঠতে যাবে, এমন সময় একটি বড়ো পাখি তাকে তুলে নিয়ে পাহাড়ের মাথায় ছেড়ে দিল। সে চারিদিকে তাকিয়ে ভাবল, পাহাড়টি জাদুর পাহাড়। সে যেই বলল, 'আমার খুব খিদে পেয়েছে।' তখনই তার সামনে খাবার এসে পৌঁছোল। সে খাবার খেয়ে বলল, 'আমি বাড়ি যাব।' তখনই সে বাড়ি পৌঁছে গেল। তারপর কবীর তার বাবা-মাকে বলল, 'আমি একটি পাহাড়ের দেশে গিয়েছিলাম, সেখানে আমার সঙ্গে অনেক কিছু হয়েছে।' কথাগুলো তার বাবা মা কেউই বিশ্বাস করলেন না। কিন্তু কথাগুলো স্বপ্ন নয়, সত্যি। ■

আল-আমীনের নির্মাণ ও বিস্তার

বর্তমান পরিসংখ্যান

- পশ্চিমবঙ্গের ১৭-টি জেলা-সহ অসম, ত্রিপুরা, বিহার ঝাড়খণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশে মিশনের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত।
- অনাবাসিক বিদ্যালয় ২৬-টি, অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রী ৫০৫৪ জন (ছাত্র ৩০৪৬, ছাত্রী ২০০৮)।
- আবাসিক ক্যাম্পাস ৫৪-টি।
- আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী ১০৮০৭ জন।
- মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবার থেকে ৩৮৬৭ জন।
- নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে ৩৭৮৬ জন।
- দারিদ্র্যসীমার নীচে থেকে ৩১৫৪ জন।
- এতিম (অনাথ) ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬৪০ জন।

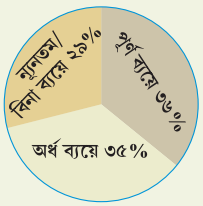

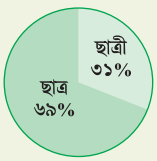

প্রাক্তনী পরিসংখ্যান

- মাধ্যমিক পাস ৫৩৮৭ জন।
- উচ্চ-মাধ্যমিক পাস ৯৩৭০ জন।
- মেডিকেলে ১৭৯৮ জন।
- ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ১৮৬৩ জন।
- স্নাতক-স্নাতকোত্তর স্তরে ৪৫৮৬ জন।
- গবেষণায় ১৪৩ জন।
- ডব্লিউবিসিএস ও অ্যালায়েড সার্ভিসে সফল ৫৫ জন।

জেলাভিত্তিক আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী

আল-আমীন মিশন

জাতির সেবায় ৩০ বছর

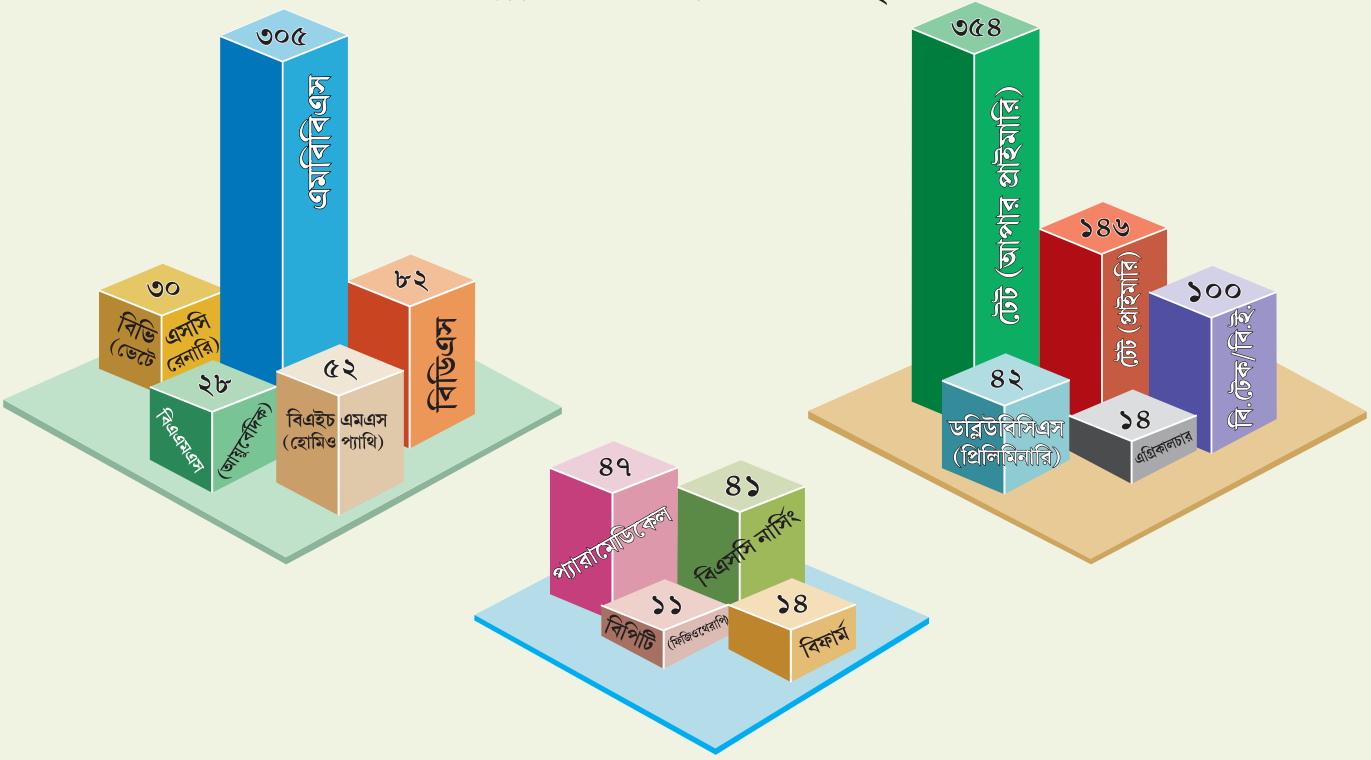

১২৬৬ জন ছাত্র-ছাত্রী সফল, ২০১৬-র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়।

Al-Ameen's English Medium Branches

A new way to life where Tradition meets Technology & Science
Modern Scientific method with Islamic value-based education

Fully Residential Secondary (X Std.) level Institutes for Boys

Al-Ameen Mission Academy, Milanmore

Milonmore, Pradhan Nagar, Siliguri, Darjeeling
Phone: 097322 54976, 087300 08124

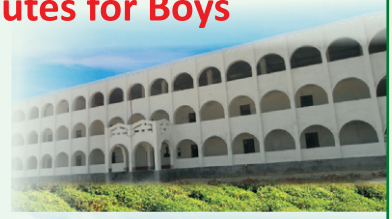

Al-Ameen Mission Academy, Kharagpur

Sadatpur, Kharagpur, Paschim Medinipur
Phone: 097336 96050, 83730 58749

Application Forms for Admission for both the campuses will be available from 8 January 2017.

Run by: **Al-Ameen Mission Trust**

Regd. Office: Khalatpur, Udaynarayanpur, Howrah 712 408, West Bengal, Ph.: 03214-257 800/801
Central Office: 53B Elliot Road, Kolkata 700 016, Ph.: 033-2229 3769, www.alameenmission.org